# LIFE OF BIN LADEN--বিশ্ব মৌলবাদী সন্ত্রাসের নেপথ্য নায়ক --বিন লাদেন



উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, মহান সংস্কারক। উম্মাহর দুর্দিনের দরদী নেতা। তাঁর ব্যক্তিত্ব দুনিয়া বিমুখতার প্রতীক। লক্ষ কোটি মুসলমানের ভালোবাসার স্বর্ণমুকুট তাঁর মাথায়। মজবুত এক অদৃশ্য বন্ধনে তিনি জুড়ে আছেন প্রতিটি মুমিন হৃদয়ের সাথে। তাঁর ভালোবাসা একদিন অজ পাড়াগাঁ'য়ের মানুষকেও রাস্তায় বের করে এনেছিল। উসামার পক্ষে সে দিন তাদের বজ্রকণ্ঠ বেজে উঠেছিল। বড়দের সেই ভালোবাসা সেদিন আমাদের ছোটদের হৃদয়ও স্পর্শ করেছিল। সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসে। সেই কণ্ঠ এখনও আমার কানে বাজে। কিন্তু কালের কৌশলী অবিচার বহু মানুষের হৃদয়ের লালিত সেই ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছে, মিডিয়ার অপপ্রচার বহু সংশয়ের জন্ম দিয়েছে তাদের মনে; ওসামার আঁচল যার দূষণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ওসামার প্রতি অকৃত্তিম ভালোবাসার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের এক ভাই। (হাফিযাহুল্লাহ) দীর্ঘ এক যুগ তার কেটেছে জেলখানায়। আফগানিস্তানে যখন আমেরিকার আগ্রাসন শুরু হয় তখন তিনি জেলে। বিন লাদেন তখন মিডিয়ার সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। আমাদের দেশের বিখ্যাত একটি জাতীয় দৈনিকে শায়খকে নিয়ে এক মার্কিন গবেষকের প্রকাশিত লেখার অনুবাদ ও বিভিন্ন বিদেশী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ছাপা হয় ধারাবাহিকভাবে। এতে উঠে এসেছে শায়খের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ নানা দিক, যা কাফেরদের দৃষ্টিতে খারাপ হলেও একজন প্রকৃত মুমিনের গুণ। যেগুলো থেকে নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে এটাই স্পষ্ট হবে যে, এমন মহৎ গুণাবলীর অধিকারী একজন মানুষ কখনই 'সন্ত্রাসী' হতে পারেন না। নিশ্চিত এটা দুশমনদের অপবাদ ও অপকৌশল মাত্র। আর এখানেই আমাদের শ্রমের স্বার্থকতা। লেখাগুলো তিনি পত্রিকার পাতা থেকে কেটে রাখেন। জেল থেকে বের হওয়ার সময় সেগুলো নিয়ে আসতে ভুলে যাননি। পরে তা পরম যত্নে রেখে দিয়েছেন। ঐ লেখাগুলো নিয়েই আমাদের এই আয়োজন, সেই অবিচার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সামান্য প্রয়াস। লেখক শত্রুপক্ষের হলেও অনেক বাস্তব বিষয় তিনি এড়িয়ে যাননি। (তবে তার দেয়া আইএসআই সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রশ্নবিদ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক) যাতে রয়েছে ভালোবাসার খোরাক, পত্র-পত্রিকার উড়াল খবরে আস্থাশীলদের সংশয়ের নিরসন।

সাহস ও আত্মবিশ্বাসের গল্প। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা। আরো রয়েছে ... লেখকের শব্দের বুলেটগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার ছাড়া তেমন কোন পরিবর্তন আমরা করিনি। এসব পরিবর্তনের আরো একটি কারণ হলো, যেন এগুলোর সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটে; এগুলোর ভীতি বিদূরীত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস আসলে যুদ্ধ-বিগ্রহেরই ইতিহাস। নদীর এ কূল ভেঙ্গে ও কূল গড়ার মত এক জাতি ও সভ্যতার জয় ও অপরটির পরাজয়ের চিত্রই তাতে দেখা যায়। নিজেকে একজন শান্তিকামী ভাবা, যুদ্ধ-জিহাদ থেকে নিজেকে পৃথক মনে করার অর্থ হলো, নিজের আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কে উদাসীন হওয়া, পৃথিবীর মূল স্রোত থেকেই নিজেকে সরিয়ে রাখা। যে চেতনা বিন লাদেনকে রাজপ্রাসাদ থেকে পাহাড়ের গুহায় এনেছিল মুসলিম উম্মাহ সেই চেতনায় উজ্জিবীত হবে, ইসলামী খেলাফতের পতাকা উড্ডীন হবে সেদিন বেশি দূরে নয়। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও তাওফিকদাতা। মেহেরবান আল্লাহ শায়খের মর্যাদা আরো অনেক বাড়িয়ে দিন। আমীন।

অনুবাদকের কথা,

আফগানিস্তানে আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরাশক্তি আমেরিকা। ক্ষেপণাস্ত্র আর বোমার মুহুর্মুহু আঘাতে কেঁপে উঠছে আফগনিস্তানের মাটি। ধ্বংস হচ্ছে নগর, গ্রাম, জনপদ। অকাতরে মরছে নিরীহ মানুষ। দেশটি পরিণত হয়েছে এক বিশাল রক্তাক্ত প্রান্তরে। আমেরিকার এই হামলার লক্ষ্য বাহ্যত একটাই বিশ্ব জিহাদের প্রাণপুরুষ ওসামা বিন লাদেনকে বন্দী কিংবা হত্যা করা। কিন্তু বিন লাদেন যেন প্রহেলিকা তাঁকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আফগানিস্তানের কোন নিভৃত গুহায় বসে জিহাদ আন্দোলনের জাল বুনে চলেছেন লাদেন কেউ জানে না। এক সৌদি ধনকুবেরের পুত্র কিভাবে বিশ্ব জিহাদের নেতৃত্বে আসলেন? আফগানিস্তান বিশেষজ্ঞ জেসন বার্ক এখানে বিন লাদেনের সেই বিস্ময়কর উত্থানের বিবরণ দিয়েছেন। বিন লাদেনের বিস্ময়কর উত্থানের নেপথ্যে রাতের আঁধারে ঢাকা একটি গ্রাম। সে গ্রামের আনাচে কানাচে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে রক্ষীরা। কালাসনিকভ ও রকেট লাঞ্চার হাতে সদাপ্রস্তত । সে গ্রামের মাটি, ইট ও কাঠের তৈরি একটি বাড়ির ভিতর ধূলিময় মেঝেতে চাদর বিছিয়ে বসে আহার করলেন দু'জন লোক। ভাত, ঝলসানো মাংস আর নিরামিষ। মাথার অনেক ওপরে অন্ধকার রাতের আকাশ চিরে ছুটে চলা আমেরিকার যুদ্ধ বিমানগুলোর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। লোক দু'টোর উভয়ের বয়স মধ্য চল্লিশের কোঠায়। শ্মশ্রুমন্ডিত। পরনে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী ঢিলেঢালা পোশাক লম্বা জামা ও সালোয়ার। খাওয়া সেরে তারা হাত মুখ ধুলেন। নামাজ পড়লেন। তারপর বসলেন আলোচনায়। এদের একজন বিশ্বের 'মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান' বলে পরিচিত ওসামা বিন লাদেন এবং অন্যজন তালেবান সরকারের প্রধান মোল্লা ওমর। তাঁদের আলোচনা করার মতো অনেক কিছুই ছিলো। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে জিহাদী হামলার প্রতিশোধস্বরূপ কিছুদিন আগে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত পৌনে ন'টায় মার্কিন ও ব্রিটিশ ক্রুজ মিসাইল আফগানিস্তানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। ফলে আফগানিস্তানজুড়ে শহর-নগর-গ্রাম-সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছে। বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর যে গ্রামে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন তার অনতিদূরে বেশ কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্র এসে পড়েছিল। আরও কয়েকটি আঘাত হেনেছিলো তালেবানদের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক ঘাঁটি দক্ষিণাঞ্চলীয় নগরী কান্দাহারে। তারা দু'জন সেখানে মিলিত হয়েছিলেন একটা সিদ্ধান্তের জন্য। হঠাৎ করেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে এখন তাদের করণীয় কী হবে তা নির্ধারণ করাই ছিল বৈঠকের উদ্দেশ্য। উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে ব্রিটেনের 'দ্য অবজার্ভার' পত্রিকার প্রতিনিধি

জানতে পারেন যে বৈঠক বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। না হবার অংশত কারণ ছিল নিরাপত্তার ভাবনা। একটা টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র নিখুঁত নিশানায় নিক্ষিপ্ত হলে পেন্টাগনের মূল টার্গেট এই দুই ব্যক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারত। বৈঠকে প্রায় সকল- বিষয়েই এ দু'জনের ঐকমত্য হয়েছিল। বৈঠক তাড়াতাড়ি শেষ হবার এটাও ছিল অংশত কারণ। মোল্লা ওমর তাঁর সৌদি বংশোদ্ভুত বন্ধুর প্রতি সমর্থন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। বিন লাদেনের জবাবও ছিল অনু রূপ। কৌশলগত প্রশ্নে তাঁরা দু'জনে দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। ঠিক হলো যে, তাঁরা যৌথভাবে যে কোন আগ্রাসন প্রতিহত করবেন। তারা তাদের বিরুদ্ধে গঠিত কোয়ালিশনে বিভেদ সৃষ্টির জন্য কাজ করবেন এবং সেই বিভেদের সদ্ব্যবহার করবেন এবং তারা বোমা হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ ও প্রতিবাদের জোয়ার সৃষ্টির জন্য মানবিক সঙ্কটকে, বিশেষ করে নিরীহ অসামরিক জনগোষ্ঠীর হতাহতের ঘটনাগুলো কাজে লাগাবেন। বৈঠক শেষে তারা পরস্পর কোলাকুলি করে যে যার পথে প্রস্থান করেন। তারপর থেকে তাদের মধ্যে আর বৈঠক হয়নি বলে ধারণা করা হয়। যে মানুষটিকে জীবিত ধরার অথবা হত্যা করার জন্য আজ আমেরিকা তার প্রায় গোটা সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই ওসামা বিন লাদেনের জীবনচিত্র পেতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৯৩০ সালে ইয়েমেনের দারিদ্র্যপীড়িত প্রদেশ হাদ্রামাউতে। সেখানে একজন ডক শ্রমিককে চোখে পড়বে। ছ'ফুট লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন তবে এক চোখ অন্ধ এই মানুষটি একদিন অনেক ভেবে ঠিক করলেন যে, বন্দরে বন্দরে জাহাজে মাল বোঝাইয়ের কাজ ছাড়াও জীবনে আরও অনেক কিছু করার আছে।

যেই ভাবা সেই কাজ। লোকটি একটা ব্যাগে কিছু কাপড় চোপড় ও টুকিটাকি জিনিস নিয়ে উটের কাফেলায় করে রওনা দিলেন সদ্য গঠিত রাষ্ট্র সৌদি আরবের উদ্দেশে। এভাবে ভাগ্যান্বেষণে শুরু হলো তার সহস্র মাইলের পথপরিক্রমা। এই মানুষটিই ওসামা বিন লাদেনের বাবা মোহাম্মাদ বিন লাদেন। মোহাম্মাদ বিন লাদেন সৌদি আরবের মাটিতে পৌঁছে প্রথম যে কাজটি পেলেন সেটা আরব আমেরিকান তেল কোম্পানি আরামকোর 'রাজমিস্ত্রি'র কাজ। দিনে মজুরি পেতেন এক রিয়াল, যার তখনকার মূল্য ছিল ১০ পেন্সের সমান। জীবন যাপনে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন তিনি। কঠোর কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়ে সঞ্চয় করতেন। সেই সঞ্চয় সার্থকভাবে বিনিয়োগ করতেন। এভাবেই এক সময় তিনি ব্যবসায় নেমে পড়েন। ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে মোহাম্মদ লাদেনকে রিয়াদে সৌদি রাজপরিবারের প্রাসাদ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় ফার্মগুলোকে সুকৌশলে ঘায়েল করে তিনি এই নির্মাণ ঠিকাদারী লাভ করেছিলেন। ওটা ছিল এক ধরনের জুয়াখেলার মতো, যেখানে তার জিত হয়েছিলো। মদীনা জেদ্দা মহাসড়ক নির্মাণের চুক্তি থেকে এক বিদেশী ঠিকাদার সরে গেলে মোহাম্মদ লাদেনের জন্য এক বিরাট সুযোগ এসে ধরা দেয়। এই সুযোগ তার বড় ধরনের সাফল্যের সোপান রচনা করে। তিনি ঐ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান এবং একজন ব্যতিক্রম ধরনের ধনী। তিনি লিখতে বা পড়তে পারতেন না এবং সারা জীবন টিপসই দিয়ে কাজ করেছেন। তবে তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ছিল । ষাটের দশকে তার সঙ্গে কাজ করেছেন এমন একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে এ তথ্যটি জানা যায়। শ্রমিক থেকে ধনী হলেও মোহাম্মদ লাদেন তার শিকড় কোথায় তা কখনই ভুলে যাননি। গরিবদের দেয়ার জন্য তিনি সর্বদাই এক তোড়া নোট বাড়িতে রেখে যেতেন। এ ধরনের দান খয়রাত ইসলামের শিক্ষা। মোহাম্মদ লাদেন ছিলেন অতি ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সুন্নী ইসলামের কঠোর ও রক্ষণশীল ওয়াহাবী ভাবধারায় লালিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গর্ব করে বলতেন যে, নিজের হেলিকপ্টার কাজে লাগিয়ে তিনি

একদিনে ইসলামের তিন পবিত্রতম স্থানে যথা মক্কা, মদীনা এবং জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারেন। মক্কা ও মদীনায় যাওয়া তার জন্য নিশ্চয়ই বিশেষ পরিতৃপ্তির কারণ ছিলো। কারণ হজ পালন ও রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনায় আগত লোকদের জন্য বিভিন্ন স্থাপনার সংস্কার ও সম্প্রাসারণ কাজের মধ্য দিয়ে তার কোম্পানির সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্টতার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত স্ট্যাটাস নিশ্চিত হয় এবং সেই সঙ্গে তিনি অমিত ধনসম্পদের অধিকরী হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে তিনি এতই ধনী ছিলেন যে, দুঃসময়ে সৌদি রাজ পরিবারকে অর্থ সাহায্য দিয়ে তিনি তাদের সঙ্কট ত্রাণে সহয়তা করতেন। তথাপি যে জীর্ণ, পুরানো ব্যাগটি নিয়ে তিনি একদিন ইয়েমেন থেকে পাড়ি জমিয়েছিলেন সেটি তার প্রাসাদোপম বাড়িতে প্রদর্শনীর জন্য রক্ষিত ছিল। শোনা যায়, বড়লোকরা যেভাবে গাড়ি বদলায়, পুরনোটি বাদ দিয়ে নতুনটি কিনে আনে, মোহাম্মাদ লাদেনও সেভাবে বউ বদলাতেন। তার তিন সৌদি স্ত্রী ছিল এবং তারা মোটামুটিভাবে ছিলো স্থায়ী। তবে চতুর্থ স্ত্রীটি নিয়মিত বদলানো হতো। ধনকুবেরের লোকেরা মধ্যপ্রাচ্যের তল্লাট ঘুরে তার পছন্দের কনে যোগাড় করে আনত। কারও কারও বয়স ছিলো পনেরো বছর। তাদের আপদামস্তক বোরখায় ঢাকা থাকত। তবে সবাই ছিল অনিন্দ্যসুন্দরী।

বিন লাদেনের মায়ের নাম হামিদা। তিনি সৌদিয়ানও নন, ওয়াহাবীও নন। তিনি এক সিরীয় বণিকের কন্যা। অসামান্য সুন্দরী হামিদা ছিলেন অত্যন্ত সরলপ্রকৃতির। বিদুষীও ছিলেন তিনি। ২২ বছর বয়সে মোহাম্মদ লাদেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ লাদেনের দশম বা একাদশ স্ত্রী। তার মানে এই নয় যে, এক সঙ্গে দশ বারোটা বউ রাখতেন মোহাম্মদ লাদেন। তিনি অনেক স্ত্রীকেই তালাক দিয়েছিলেন। তবে তালাক দিলেও জেদ্দা বা হেজাজে তাঁদের জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দশম বা একাদশ স্ত্রী হামিদার গর্ভে মোহাম্মদ লাদেনের সপ্তম পুত্র ওসামা বিন লাদেনের জন্ম ১৯৫৭ সালে। পিতার বিপুল বিত্ত ও বৈভবের পরিবেশে বিন লাদেন বড় হয়ে উঠতে থাকেন। ওসামা ১১ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। বাবার সান্নিধ্য কখনই খুব বেশি একটা লাভ করেননি তিনি।

১৯৯৮ সালে বিন লাদেনের এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের মাধ্যমে আমেরিকার এবিসি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক লাদেন পরিবারের ওপর একটি দলিল হস্তগত করে। তা থেকে লাদেনের ছেলেবেলার অনেক কথা জানা গেছে। তাঁর বাবা ছিলেন অতিমাত্রায় কর্তৃত্বপরায়ণ। নিজের সব সন্তানকে তিনি এক জায়গায় রাখতে চাইতেন। তাঁর শৃঙ্খলা ছিল অত্যন্ত কঠিন। সন্তানদের সবাইকে কঠোরভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হত। একই সঙ্গে আমোদ প্রমোদও পছন্দ করতেন তিনি। সন্তানদের নিয়ে তিনি সমুদ্র ভ্রমণে যেতেন। মরুভূমি পাড়ি দিতে যেতেন। ছেলে মেয়েদের তিনি বড়দের মতো জ্ঞান করে সেভাবেই তাদের সঙ্গে আচরণ করতেন। তিনি চাইতেন কচি বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা আত্ম বিশ্বাসের পরিচয় দিক। কৈশোরে বিন লাদেনকে জেদ্দায় 'আল আগ' নামে এক স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিলো। পাশ্চাত্য স্টাইলের এক অভিজাত সৌদি স্কুল। ১৯৬৮-৬৯ সালে বিন লাদেন যখন এ স্কুলে পড়তেন তখন সেখানে ব্রায়ান কাইফিল্ড শাইলার (৬৯) নামে একজন ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি সে

সময় লাদেনসহ ত্রিশজন বিত্তবান পরিবারের ছেলেকে সপ্তাহে চারদিন এক ঘণ্টা করে ইংরেজী পড়াতেন। ব্রায়ান শাইলার বিন লাদেনকে ভদ্র ও বিনয়ী হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন, ছেলেটা বেশ লাজুক ছিল। নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করত।

শাইলারের ভাষায়ঃ 'ক্লাসের যে কোন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি বিনয়ী ও ভদ্র ছিল বিন লাদেন। শারীরিক দিক দিয়েও সে ছিল অসাধারণ। অধিকাংশ ছেলের চেয়ে সে ছিল লম্বা, সুদর্শন ও উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের অধিকারী। শুধু ভদ্র ও বিনয়ী নয়, তাঁর ভিতরে প্রবল আত্মবিশ্বাসও ছিলো। কাজকর্মে অতি সুচারু, নিখুঁত ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলা। নিজেকে মোটেই প্রকাশ করতে চাইত না সে। বেশিরভাগ ছেলে নিজেদের বড় বুদ্ধিমান বলে ভাব দেখাত। বিন লাদেন তাদের মতো ছিল না। কোন প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলে সে নিজ থেকে বলত না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলেই শুধু বলত।'

বিন লাদেন যে একজন কঠোর ধর্মানুরাগী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন কৈশোরের প্রথমদিকে তেমন কোন লক্ষণ ধরা পড়েনি। ১৯৭১ সালে মোহাম্মদ লাদেনের পরিবার সদলবলে সুইডেনের তাম্র খনিসমৃদ্ধ ছোট শহর ফালুনে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। সে সময় একটা ক্যাডিলাক গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো হাল্কা সবুজ টপ ও নীল রঙের ফ্লেয়ার পরা হাস্যোজ্জ্বল ওসামার একটা ছবি তোলা আছে। ওসামা সে সময় কখনও নিজেকে "স্যামি" বলে উল্লেখ করতেন। ওসামার বয়স তখন ১৪ বছর। এর এক বছর আগে ওসামা ও তাঁর অগ্রজ সালেম প্রথমবারের মতো ফালুনে গিয়েছিলেন। সৌদি আরব থেকে বিমানযোগে কোপেনহেগেনে আনা একটা রোলস্রয়েস গাড়ি চালিয়ে তাঁরা ফালুনে গিয়ে পৌঁছেন। আশ্চর্যের কথা হলো, তাঁরা এস্টোরিয়া নামে একটা সস্তা হোটেলে ছিলেন। হোটেলের মালিক ক্রিস্টিনা আকের ব্রাদ নামে এক মহিলা সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছেন যে, ওরা দিনের বেলা বাইরে কাজকর্ম করে বেড়াত আর সন্ধার পর নিজেদের রুমে খাওয়া দাওয়া করে কাটাত। মহিলা বলেন, 'আমার মনে আছে ওদের কথা। সুন্দর দুটো ছেলে। ফালুনের মেয়েরা ওদের খুব পছন্দ করত। ওসামা আমার দু ই ছোট ছেলের সঙ্গে খেলত।'

হোটেলের মালিক সেই মহিলা ছেলে দুটোর রুম পরিষ্কার করতে গিয়ে তাদের যে সম্পদের পরিচয় পেয়েছিলেন সে কথাও স্মরণ করেছেন তিনি। বলেছেনঃ 'উইকএন্ডগুলোতে আমরা দেখতাম ওরা ওদের রুমে একটা বাড়তি বিছানায় কাপড় চোপড় বিছিয়ে রাখত। সেলোফিনে প্যাকেট করে রাখা অসংখ্য সাদা সিল্কের শার্ট ছিলো ওদের। মনে হয় প্রতিদিন নতুন একটা শার্ট গায়ে চড়াত। ময়লা কাপড়গুলো কখনও দেখিনি, ওগুলো কি করত কে জানে। বড় একটা ব্যাগ ভর্তি অলঙ্কারও ছিলো তাদের। হীরা, চুনি, পান্নার আংটি ছিল। টাইপিনও ছিল।' লাদেন ভ্রাতারা ঐ বছর গ্রীষ্মের ছুটি কটাতে লন্ডনেও গিয়েছিলেন। ওখানে টেমস নদীতে তাঁরা নৌকা ভ্রমণও করেছিলেন। এ সময়ের তোলা বিন লাদেন ও তাঁর ভ্রাতাদের ছবিও কারও কারও কাছে পাওয়া গেছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে বিন লাদেন কি পরিমাণ ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন নিশ্চিতভাবে কেউ কিছু বলতে পারে না। অনেক সময় বলা হয়, বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। ২৫ কোটি ডলার কি তারও বেশি। কিন্তু প্রকৃত অর্থের পরিমাণ হয়ত তার চেয়ে অনেক কম। অর্থের জন্য কখনও লালায়িত ছিলেন না তরুণ লাদেন। বস্তুত পক্ষে তাঁর পিতা যেভাবে অমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন সেই বিষয়গুলো বিন লাদেনকে পীড়িত করতে শুরু করেছিল। সত্তরের দশকের প্রথমভাগে মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল এক সাংস্কৃতিক রুপান্তর ঘটে গিয়েছিলো। তেল রাজস্ব, ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ এই ঘটনাগুলো আগের স্থিরকৃত বিষয়গুলোকে নতুন করে পর্যালোচনা করতে বাধ্য করে। নতুন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে এ প্রশ্ন তুলে ধরে। মোহাম্মদ বিন লাদেনের অসংখ্য ছেলেমেয়ের অধিকাংশই সে প্রশ্নের জবাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ে। পরিবারের বড়রা মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার ভিক্টোরিয়া কলেজ, হর্ভার্ড, লন্ডন কিংবা মায়ামিতে পড়তে চলে যায়। কিন্তু বিন লাদেন যাননি। সে সময় এ অঞ্চলের আরও হাজার হাজার তরুণের মতো ওসামা বিন লাদেন কঠোর ইসলামী ভাবাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন।

৩র‌্যাডিকেল ভাবধারার পথে

১৯৭৪ সালে জেদ্দায় হাই স্কুলে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ওসামা বিন লাদেন ঠিক করলেন যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্য ভাইদের মত তিনি বিদেশে পাড়ি জমাবেন না, দেশেই থাকবেন। তার ভাই সেলিম তখন পরিবারের প্রধান। তিনি ইংল্যান্ডের মিলফিল্ডে সমারসেটের এক বোডিং স্কুলে থেকে লেখাপড়া করেছিলেন। আরেক ভাই ইসলাম প্রথমে সুইডেনে ও পরে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। ওসামা কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতি অনুষদে ভর্তি হন। গুজব আছে যে, ১৭ বছর বয়সে ওসামা তার মায়ের এক সিরীয় আত্মীয়কে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনিই নাকি তার প্রথম স্ত্রী। অবশ্য এটা আজ পর্যন্ত কোন মহল থেকেই সমর্থিত হয়নি। বাবার মৃত্যুর পর লাদেনের ব্যবসায় সাম্রাজ্য পরিচালনা করছিলেন বড় ভাই সেলিম।

তিনি আশা করেছিলেন যে, ওসামা পারিবারিক ব্যবসায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ওসামার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিন লাদেনের পছন্দ ছিল ইসলামী শিক্ষা। পরবর্তীকালে তিনি এই দুটি বিষয়কে আশ্চর্য উপায়ে সমন্বিত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণকারী জর্দানী শিক্ষাবিদ ও অনলবর্ষী বক্তা আব্দুল্লাহ আযযামের টেপ রেকর্ডকৃত বক্তব্য শোনেন। এগুলো তার ওপর সুগভীর প্রভাব ফেলে। আযযামের বাণীবদ্য উপদেশাবলী অনেকটাই ছিল আজকের ওসামার ভিডিও টেপের মতো। আযযামের সেই সব বক্তব্য শুধু ওসামাকেই নয়; তার মতো আরো অনেক বিক্ষুব্ধ তরুণ মুসলমানের মনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। জেদ্দা তো বটেই বিশেষ করে সেখানকার বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামী চিন্তাধারার প্রাণকেন্দ্র।

জেদ্দার মসজিদ ও মাদরাসাগুলোতে বিরুদ্ধবাদীরা র‍্যাডিকেল ভাবধারা প্রচার করত। বলত যে, একমাত্র রক্ষণশীল ইসলামী মূল্যবোধের সর্বাত্মক পূনর্প্রতিষ্ঠাই মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্যের বিপদ ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে। বিন লাদেনের এক ভাই আব্দুল আজিজ এসময়ের কথা স্মরণকরে বলেছেন যে, ওসামা তখন সর্বক্ষণ বই পড়তেন আর নামায কালাম নিয়ে থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপে, বিশ্লেষণকরে ধর্ম বিষয়ক বিতর্ক ও কুরআন শিক্ষার পর্যালোচনায় তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ওসামা এসময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তোলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো সৌদি রাজ পরিবারের তরুণ সদস্য ও সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার ভাবী প্রধান প্রিন্স তুর্কি বিন ফয়সালের সংঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা।

তবে এসময়ের ঘটনা প্রবাহ তার মনে গভীর রেখাপাত করে। যেমন ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ইরান প্রত্যাবর্তন, পরাক্রান্ত শাহকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এ ঘটনায় মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র যুগপৎ উত্তেজনা ও আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায়। সে বছরের নভেম্বর মাসে শিয়া চরমপন্থীরা মক্কার কাবা শরীফের মসজিদুল হারাম দখল করে নেয়। ওসামা বিন লাদেন তখন বয়সে তরুণ। সহজে প্রভাবিত হবার মতো মন তখন তার। তিনি উত্তরোত্তর গোঁড়া মুসলমান হয়ে উঠছিলেন বটে, তবে কোন্ পথ বেছে নেবেন সে ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারছিলেন না। কাবা শরীফে উগ্রপন্থী হামলা ও মসজিদ দখলের ঘটনায় তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রচুর রক্ত পাতের পর শিয়া চরমপন্থীদের পারাস্ত করা হয়েছিলো। তবে এই উগ্রপন্থী বিদ্রোহীরা তাকে অনুপ্রাণিত করে। এদেরকে তার ন্যায় ও সত্যের পথ অনুসরণকারী খাঁটি মুসলমান বলে মনে হয়। অচিরেই ওসামা বিন লাদেন এদের পদাঙ্ক অনুসরণের সুযোগ পেয়ে যান। ঐ বছরের শেষ দিকে সোভিয়েত ট্যাংক বহর আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে এক নতুন পরিস্থিতির জন্ম দেয়। সোভিয়েত হামলার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় আফগান জনগনের জিহাদ এবং সেই জিহাদে অংশ নিতে ওসামা বিন লাদেন এক পর্যায়ে সুদূর সৌদি আরব থেকে পাড়ি জমান আফগানিস্তানে।

## রণাঙ্গনে

পেশোয়ার থেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকলেই দেখা যাবে একটা ছোট্র গ্রাম। নাম জাজি। ১৯৮৬ সালে এই গ্রামে সোভিয়েত গ্যারিসনের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায় আফগান মুজাহিদ বাহিনী। একদিন সকালে এই বাহিনীর এক সিনিয়র কমান্ডার সোভিয়েত সৈন্যদের মুহুর্মুহু মর্টার হামলার মুখে একটি বাঙ্কারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মর্টারের গোলায় একের পর এক বিষ্ফোরণে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এমনি সময় কোথা থেকে সেই বাঙ্কারে ডাইভ মেরে প্রবেশ করেন দীর্ঘদেহী একে আরব। তিনি আর কেউ নন ওসামা বিন লাদেন। লাদেন নিজে তখন সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। তাঁর ‘স্থলযুদ্ধ’ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আশির দশকের মাঝামাঝি আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ জোরদার হয়ে ওঠে। পেশোয়ারের ডর্মিটরিগুলো হাজার হাজার মুসলমান তরুণে ছেয়ে যায়। সবাই যে একই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা নয়। কেউ এসেছিলো এ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। কেউ সহকর্মী বা বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার টানে। কেউ বা আইনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায়। তবে বেশিরভাগই এসেছিলো ইসলামের পক্ষে ধর্মীয় যুদ্ধ তথা জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য। এখানে আরও

একটা কথা বলে নেয়া ভালো যে, সে সময় আফগান প্রতিরোধ যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠার আংশিক কারণ ছিল প্রতিরোধ সংগ্রামে আমেরিকার আর্থিক সাহায্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া। ১৯৮৬ সালের গোটা গ্রীষ্মকাল বিন লাদেন জাজি গ্রামটির আশপাশের লড়াইয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। একবার তিনি প্রায় ৫০ জন আরব যোদ্ধার একটি বাহিনী নিয়ে সোভিয়েত হেলিকপ্টার ও পদাতিক বাহিনীর টানা আক্রমণ প্রতিহত করেন। মিয়া মোহাম্মদ আগা নামে তখনকার এক সিনিয়র আফগান কমান্ডার বর্তমানে তালেবান বাহিনীতে রয়েছেন, তিনি সে সময় বিন লাদেনের যুদ্ধ তৎপরতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার বিবরণ দিয়েছেন। পরবর্তী তিন বছর বিন লাদেন আরও কঠিন লড়াই চালিয়ে যান। এতে অনেক সময় তাঁর নিজেরও জীবন বিপন্ন হয়েছিলো।

## সুদানে নির্বাসন

কয়েক মাস আগে ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে আক্রমণ করেন। ওসামা বিন লাদেন সে সময় তাঁর জন্মস্থান জেদ্দা শহরে বসবাস করছিলেন। ইরাকী হামলা শুরু হবার পরপরই তিনি সৌদি রাজপরিবারের কাছে একটা বার্তা পাঠান। তাতে তিনি সাদ্দামকে পরাজিত করার জন্য আফগান যুদ্ধাভিজ্ঞ ত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের একটি বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। বার্তায় লাদেন বলেন, যারা রুশ বহিনীকে হারিয়ে দিয়েছে তারা সহজেই সাদ্দাম হোসেনকেও হারাতে পারবে। এমন একটা বাহিনী গঠিত হলে তিনি যে সে বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন তা আর বলার অপেক্ষা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবটা দিয়ে প্রচন্ড এক ধাক্কা খেয়েছিলেন বিন লাদেন। বড়ই নির্মম, বড়ই হৃদয়হীনভাবে। সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল সৌদ পরিবার ধর্মানুরাগী ইসলামপন্থীদের কোনো বাহিনী চাননি। একেবারে কিছুতেই না। রাজ পরিবারের সিনিয়র সদস্যরা লাদেনকে সাক্ষাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রস্তাবটা সটান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারা। প্রিন্স আব্দুল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাতকারটি ছিলো সেগুলোরই একটি। কিন্তু তার চেয়েও আরও খারাব কিছু অপেক্ষা করছিলো বিন লাদেনের জন্য। ইসলামের সূতীকাগার সৌদি আরব তথা পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনাকে রক্ষা করার জন্য যেখানে তিনি একটা ইসলামী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিলেন। সেখানে দেখতে পেলেন এই দায়িত্বটাই তুলে দেয়া হয়েছে আমেরিকানদের হাতে। রাগে অপমানে ফুঁসতে লাগলেন বিন লাদেন। তাঁর দেশে তিন লাখ মার্কিন সৈন্য এসে পৌঁছল। তারা ঘাঁটি নির্মাণ শুরু করে দিল। মদ্যপান ও সানবাথিং করতে লাগল। এসব দেখে যাওয়া ছাড়া বিন লাদেনের আর কিছুই করার রইল না। তিনি এই সৈন্যদের উপস্থিতিকে বিদেশীদের আগ্রাসন বলে গণ্য করতে লাগলেন।

বিন লাদেন একেবারে চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি গোটা উপসাগরের আলেম সমাজ ও জিহাদপন্থী মুসলমানদের মধ্যে প্রচার কাজ চালাতে শুরু করলেন। ইতোমধ্যে তিনি একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। সেই পরিচিতিকে পুঁজি করে তিনি সৌদি আরবের সর্বত্র বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। মসজিদগুলোর মাধ্যমে হাজার হাজার অডিও টেপ প্রচার করতে লাগলেন। বিন লাদেনের তৎপরতা এখানেই

সীমাবদ্ধ রইল না। তিনি তার সেনাবাহিনীর লোক রিক্রুট করার কাজ শুরু করলেন। ট্রেনিং লাভের জন্য প্রায় চার হাজার রিক্রুটকে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। সৌদি শাসকগোষ্ঠী অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। একদিন হানা দেয়া হলো লাদেনের বাড়িতে। গৃহবন্দী করা হল তাকে। উদ্বিগ্ন হলো বিন লাদেনের পরিবার। ওসামার কার্যকলাপের ফলে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভেবে ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হলো। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। পরিশেষে তাঁরা বিন লাদেনকে সত্যিকার অর্থে ত্যাজ্য করতে বাধ্য হলো। লাদেনের উপর চাপ আরও বৃদ্ধি পেল।

১৯৯০ সালের শেষ দিকে লাদেনের জন্য একটা পালনের পথ দেখা দিল। বিন লাদেন সুদানের স্বনামধন্য ইসলামী তাত্বিক ও পন্ডিত হাসান আল তুরাবির কাছ থেকে আশ্রয়ের প্রস্তাব পেলেন। এই কিংবদন্তি পুরুষ তখন ছিলেন কার্যত সুদানের প্রকৃত শাসক। তুরাবি বিশ্বাস করতেন যে, সাদ্দাম হোসেনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে এবং ধর্মনিরপেক্ষ আরব সরকারগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করতে পারলে মুসলিম বিশ্বজুড়ে একটা ‘বিশুদ্ধ’ ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাওয়া যাবে। যাই হোক বিন লাদেনকে দেয়া তুরাবির প্রস্তাবটি সত্যই প্রলুব্ধকর ছিলো। সৌদি সরকারও লাদেনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এমন একটা সুযোগ পেয়ে নিজেদের কপালকে ধন্যবাদ দিলো। তারা বিন লাদেনের ওপর চাপের মাত্রাটা আরও বাড়াল, যাতে তিনি সৌদি আরব ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

চাপের মুখে বিন লাদেন এক সময় ভাগলেন। তিনি সৌদি আরব থেকে সুদানের রাজধানী খার্তুমে পালিয়ে গেলেন। সেই যে গেলেন আর তিনি স্বদেশে ফিরতে পারলেন না। ওসামা বিন লাদেন খার্তুমের অভিজাত শহরতলীতে চার স্ত্রী, সন্তানসন্ততি এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন নিয়ে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। তারপর এক বৃহত্তর সংগঠনের ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য আফগানিস্তান থেকে বিমানে করে যুদ্ধাভিজ্ঞ বেশ কয়েক শ’ আরব স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে এলেন। সুদানে জীবনযাত্রায় বৈচিত্র ছিল। ফুটবল ম্যাচ হতো। নীল নদে সাঁতার প্রতিযোগিতা হতো। অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য শিয়া-সুন্নী ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন কি না এ নিয়ে কমনরুম টাইপের বিতর্ক হতো। বিতর্ক হতো ইসলামী মতবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে। সুদানে বিন লাদেন নিজের নামে ব্যক্তিগত ব্যাংক এ্যাকাউন্টও খুললেন।

তখন লাদেনের বেশিরভাগ সময় বিশ্বব্যাপী জিহাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার চাইতে বরং অর্থোপার্জনের কাজেই ব্যয় হচ্ছিল। ওসামা বিন লাদেনের সহায় সম্পদ নিয়ে কল্পনার শেষ নেই। লন্ডনে নিযুক্ত সৌদি আরবের প্রবীণ রাষ্ট্রদূত গাজী আল গোসাইবি সম্প্রতি বলেছেন: আমি এমন খবরও পাঠ করেছি যে, লাদেন ৩০ থেকে ৪০ কোটি ডলার সরাসরি লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কথাটা মোটেই ঠিক নয়। সৌদি আরব ছেড়ে চলে যাবার সময় তিনি ঐ পরিমাণ অর্থ সঙ্গে নেননি। অন্যদিকে সৌদি কর্তৃপক্ষও সর্বদা শ্যেন দৃষ্টি রেখেছিল। যাতে সৌদি আরব থেকে লাদেন কানাকড়িও না নিয়ে যেতে পারেন।

খার্তুমে বিভিন্ন সংগঠনের অফিস ছিল। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অফিসটি ছিল লাদেনের আল কায়েদা সংগঠনের। তাঁর সংগঠনটি অন্য যে কোনো সংস্থার মতোই পরিচালিত হত। সংগঠনের বোর্ড অব ডিরেক্টর বা পরিচালকমন্ডলী ছিল। বেশ কয়েকটি উপকমিটি ছিল। এসব কমিটি আর উপকমিটির অনবরত বৈঠক লেগেই থাকত।

তার সংগঠন একটি ব্যবসায় কোম্পানি চালাত। যার নাম ছিল লাদেন ইন্টারন্যাশনাল। এছাড়া চালাত বৈদেশিক মুদ্রার ডিলারশিপ। চালাত একটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এবং একটি কৃষিপণ্যের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বিন লাদেন রাজধানী খার্তুম থেকে পোর্ট সুদান পর্যন্ত সাতশ' মাইল দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তারই বিনিময়ে সুদান সরকার তাকে তিলের বীজ রপ্তানীর একক অধিকার প্রদান করে। সুদান হল বিশ্বের সর্বাধিক তিল উৎপাদনকারী তিনটি দেশের অন্যতম একটি দেশ। সুতরাং বলাই বাহুল্য সুদান থেকে তিল রপ্তানীর ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ছিল। এই ব্যবসা থেকে বেশ ভালো মুনাফা করেছিলেন বিন লাদেন। তবে তার অন্যান্য ব্যবসা অতটা সফল হতে পারেনি। আজারবাইজান থেকে বাইসাইকেল আমদানির একটা উদ্যোগ সম্পূর্ণ মার খেয়েছিল। আরও কিছু হঠকারী স্কিমও নেয়া হয়েছিল। সেগুলো আধাআধি বাস্তবায়িত হবার পর চোরাবালির মধ্যে হারিয়ে যায়। কিন্তু তারপরও আল কায়েদার মূল ব্যবসা কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ বিন লাদেনের হাতে ছিল। তবে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পিছনে মূল যে উদ্দেশ্য সেটা কখনও বিন লাদেনের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়নি। জর্ডানের জিহাদপন্থী ইসলামীদের নগদ এক লাখ ডলারেরও বেশি দেয়া হয়েছিল। চেচনিয়ায় ইসলামী জিহাদীদের গোপনে নিয়ে আসার জন্য বাকুতে অর্থ পাঠিয়ে দেয়া হয়। আরও এক লাখ ডলার পাঠানো হয় ইরিত্রিয়ার ইসলামী সংগঠনের জন্য। এক পর্যায়ে বিন লাদেন আড়াই লাখ ডলার দিয়ে একটা প্লেন কেনেন। এবং এক পাইলটকে ভাড়া করেন। ক'দিন পরই বিমানটি দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয়। তিনি সুদানে বেশ কয়েকটি সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেন। শত শত আলজেরীয়, ফিলিস্তিনী, মিসরীয় ও সৌদি নাগরিক এসব শিবিরে বোমা তৈরির কৌশলসহ নানা ধরনের জিহাদী কলাকৌশল শিক্ষা লাভ করে। এদের অনেকে আফগান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এসব ইসলামী মুজাহিদের মধ্যে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারককে হত্যার কথাবার্তা ওঠে। কিন্তু সেই হত্যা পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত ছিল না।

নাইরোবিতে মার্কিন দূতাবাসসহ পূর্ব আফ্রিকায় বোমা হামলার সম্ভাব্য টার্গেটগুলোর ওপর কিছু এলোমেলো গুপ্তচরগিরিও চালানো হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারির মধ্যে সুদান তার বিশেষ অতিথি বিন লাদেনকে নিয়ে উত্তরোত্তর অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। হাসান আল তুরাবি তখন আফগানিস্তানে নিযুক্ত সুদানী রাষ্ট্রদূত আতিয়া বাদাবির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাদাবি পেশোয়ারে থাকতেন। রুশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় তিনি পশতু ভাষা শিখেছিলেন। আফগান মুজাহিদদের অনেকের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এবং কারোর কারোর

সঙ্গে চমৎকার যোগাযোগও ছিল। আফগানিস্তান তখন বিবাদমান সেনা কমান্ডারদের নিয়ন্ত্রণাধীন শত শত এলাকায় খন্ড বিখন্ড ছিল। আতিয়া বাদাবি এমন এক পটভূমিতে জালালাবাদের সবচেয়ে সিনিয়র তিনজন কমান্ডারকে সহজেই একথা বুঝাতে পেরেছিলেন যে একজন ধনবান সৌদিকে তারা যদি নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে তাহলে তাদের অনেক লাভ হবে। বিশেষ করে প্রতিপক্ষের ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে তিন কমান্ডার এরপর সুদানে গিয়ে সরাসরি বিন লাদেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে আফগানিস্তানে ফিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এই তিনজন কমান্ডারের কেউই আজ জীবিত নেই।

## ১৯৯৬-৯৮ মুজাহীদ বাহিনী গঠন

কাবুলে শরতের এক সন্ধা। উত্তরাঞ্চলীয় শহরতলী ওয়াজির আকবর খানের উঁচু দালানঘেরা এক বাড়ির বাইরে ডজনখানেক জাপানী পিক আপ ট্রাক দাঁড়ানো। ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রক্ষী ও ড্রাইভাররা রুশ বাহিনী চলে যাওয়ার পর থেকে সাত বছরে বড় ধরনের কোন লড়াই এখানে না হলেও প্রতিটি বাড়ির দেয়ালে এবং সেগুলোর সামনে স্তূপ করে রাখা বালির বস্তার গায়ে গুলির বা বোমার টুকরার আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে ১৯৯৬ সালের অক্টবর মাস তখন। ওসামা বিন লাদেন তালেবান নেতাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কাবুলে এসেছেন। নগরীতে ওটাই ছিল তার প্রথম আগমন এবং একমাস আগে ক্ষমতা দখলকারী কট্টর ইসলামী মিলিশিয়া বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে ওটাই ছিল তার প্রথম সাক্ষাত। সে বছরের মে মাসের বিশষভাবে ভাড়া করা এক পরিবহন বিমানে করে ৩৯ বছর বয়স্ক বিন লাদেন তার চার স্ত্রীর মধ্যে তিন স্ত্রী, আধ ডজন ছেলে মেয়ে ও তার অনুসারী শ খানেক আরব যোদ্ধা জালালাবাদ বিমান বন্দরে এসে পৌঁছান।

কিন্তু যে তিনজন মুজাহিদ কমান্ডার সুদান থেকে তাকে আফগানিস্তানে চলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন তারা এ কয়েক মাসের মধ্যে উৎখাত হয়ে যান এবং এ অবস্থায় বিন লাদেনের আফগানিস্তানের নতুন সরকারের অনুগ্রহভাজন হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক মাস আগে বিন লাদেন তার এক লিবীয় সহযোগীকে কান্দাহারে তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মোল্লা ওমর তখন তালেবান উপনেতা ও কাবুলের মেয়র মোল্লা মোহাম্মদ রব্বানীকে বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাত করার নির্দেশ দেন এবং তিনি সত্যি কতটা বন্ধুভাবাপন্ন তা যাচাই করে দেখতে বলেন। সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে এক বৈঠক হয় এবং ঐ বৈঠক উপলক্ষেই কাবুলে এসেছিলেন বিন লাদেন। বৈঠকে দু'পক্ষই ছিলেন সতর্ক অথচ বন্ধুভাবাপন্ন। লাদেনই প্রথম কথা বলেন। নিজেদের মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ভুলে গিয়ে তিনি মিলিশিয়াদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অর্জিত সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং নিঃশর্তভাবে নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। রব্বানী খুবই খুশি ও তুষ্ট হন। তিনি বিন লাদেনকে সরকারের তরফ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। বৈঠক থেকে সবাই হাসি মুখে বেরিয়ে আসে।

লাদেন ও তালেবানদের মধ্যে এই মৈত্রী নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এটা ছিল বিন লাদেনের বিকাশের চূড়ান্ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা। তালেবানদের নিরাপত্তা আদায় করতে সক্ষম হয়ে তিনি এবার বিশ্বের এযাবতকালের সবচেয়ে দক্ষ একটি জিহাদী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে হাত দেন।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ নিয়ে বিন লাদেন অতি প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাসই কেবল অর্জন করেননি, গোটা ইসলামী বিশ্বে যোগাযোগের এক ব্যাপক বিস্তৃত নেটওয়ার্কও গড়ে তুলেছিলেন। তদুপরি খ্যাতি, শ্রদ্ধা ও প্রশংসার স্বাদও পেয়েছিলেন তিনি। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে তার ভূমিকা লাদেনের পরিচিতি ও কর্তৃত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। সুদানে তিনি গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য স্থানের অনৈসলামীক সরকারগুলোকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত মুসলিম জিহাদীদের ছত্রছায়া সংগঠন আল কায়েদা গঠনের কাজে গুরুত্বের সাথে হাত দিতে সক্ষম হন। তবে সামরিক শক্তি-সামর্থ্য ও রণকৌশলগত চিন্তাধারার দিক দিয়ে বিন লাদেনের এই সংগঠনটি তখনও যথেষ্ট দুর্বল ছিল। আফগানিস্তানে এসে তিনি এ সমস্যার দ্রুত একটা সমাধান খুঁজে পান। যিনি এমন একটি দেশে ফিরে আসেন যেখানে ছয় বছর ধরে নৈরাজ্য চলছিল। হাজার হাজার জিহাদপন্থী মুসলিম দেশের পূর্বাঞ্চলে মুজাহিদদের পুরনো কমপ্লেক্সগুলোতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। এদের অনেককে পৃষ্ঠপোষকতা করতো পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। যারা এই ধর্মানুরাগী যুদ্ধাদেরকে কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহার করতে চাইতো। অন্যরা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো সমগ্র বিশ্বের নানা মত ও পথের ইসলমী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে।

এসব জিহাদীদের শিবিরে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবককে গেরিলাযুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া হতো। এই স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকে তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। আফগানিস্তানে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিন লাদেনের প্রথম সমস্যাটির আংশিক সমাধান হয়ে যায়। তিনি একটা তৈরি সেনাবাহিনী পেয়ে যান। আফগানিস্তানে বিন লাদেনকে সাহায্য করার জন্য তাঁর চার পাশে অসংখ্য লোক এসে জড়ো হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ছিল কয়েক ডজন প্রবাসী মিসরীয় কট্টোর ধর্মানুরাগী মুসলিম। এদের মধ্যে ছিলেন ৩৭ বছর বয়স্ক শল্য চিকিৎসক ও মিসরের আল-জিহাদ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ডা. আইমান আল জাওয়াহিরি। আরেকজন ছিলেন ঐ গ্রুপেরই লৌহমানব ও সুযোগ্য সামরিক কমান্ডার মোহাম্মদ আতেফ। আল জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে শিখিয়েছিলেন। আর মোহাম্মদ আতেফ তাকে সামরিক ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো একান্ত প্রয়োজন সে গুলোর গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন। বেশ কিছু নিরাপত্তাগত ঝুঁকি দেখা দেয়ার পর বিন লাদেন তার আবাসস্থল জালালাবাদের দক্ষিণে পাহাড়ি অঞ্চলের তোরাবোরা নামক একটি স্থানে এক প্রাক্তন মুজাহিদ ঘাঁটিতে সরিয়ে নেন। মহানুভবতা প্রথম প্রথম নিজেকে একটু আড়ালে-অন্তরালে রাখতেন ওসামা বিন লাদেন। কখনই পাদপ্রদীপের আলোয় আসতেন না তিনি। পাকিস্তানী সাংবাদিকদের মনে আছে, আশির দশকের প্রথম দিকে তারা একজন সৌদি শেখ সম্পর্কে অনেক রকম কাহিনী শুনেছিলেন। এই শেখ পেশোওয়ার শহরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে আহত যোদ্ধাদের দেখতে আসতেন । তাদেরকে কাজুবাদাম, চকোলেট উপহার দিতেন। তাঁদের নাম ঠিকানা টুকে নিতেন। ক'দিন পরই মোটা অঙ্কের একটা চেক পৌঁছে যেত তাদের পরিবারের হাতে। এধরনের মহানুভবতা সম্ভবত বাবার

কাছে শিখেছিলেন ওসামা বিন লাদেন। কারণ, বাবাকে মাঝে মাঝে গরিবদের মধ্যে থোকা থোকা নোট বিলাতে দেখতেন তিনি। যারা লাদেনের জন্য লড়েছেন কিংবা লাদেনের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছেন তাঁদের প্রায় সবাইকে বিন লাদেনের এই মহানুভবতার কথা উল্লেখ করতে শোনা গেছে। কেউ কেউ জানিয়েছেন যে বিয়ের জন্য দেড় হাজার ডলার দান পেয়েছেন বিন লাদেনের কাছ থেকে। আবার কেউ বলেছেন জুতা বা ঘড়ি কেনার জন্য বিন লাদেনের কাছ থেকে নগদ অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। তাঁর অনুসারীরা বলেন, বাইআ'ত বা শপথ উচ্চারণের যে কাজ এধরনের দান-সাহায্য বা উপহারও সেই একই কাজ করেছে। তাঁদের আমীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বিন লাদেনের সময় ছিল তাঁর অর্থের মতোই মূল্যবান। তা সত্ত্বেও যে কাউকে যে কোন রকম সাহায্য করতে তিনি কখনই বিমুখ হতেন না। একজন আফগান মুজাহিদ স্মরণ করেছেন কিভাবে বিন লাদেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সেই মুজাহিদ একবার আরবী শিখতে চাইলেন। বিন লাদেন সে সময় ব্যস্ত ছিলেন। তথাপি এই সৌদি যুবক তাঁকে কুরআনের ভাষা- আরবী ভাষা শিখানোর কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছিলেন। বিন লাদেন একজন র‍্যা ডিক্যাল বা কট্টোর ধর্মানুরাগী হিসেবে সুপরিচিত। তথাপি আচার-ব্যবহারে তিনি বরাবরই শান্ত, নম্র ও মিতভাষী। যেমনটি তিনি ছেলেবেলায় ছিলেন; বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর শিক্ষকরা। ১৯৮৪ সালে বিন লাদেন ও আয্যাম পেশোয়ারের শহরতলিতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নগরীতে আগমনরত হাজার হাজার আরব মুজাহিদের জন্য একটি সরবরাহ ঘাঁটি স্থাপন করেন। এবং সেটার নাম দেন বায়তুল আনসার বা বিশ্বাসীদের গৃহ। বিন লাদেন সেখানে আরব স্বেচ্ছসেবকদের গ্রহন করতেন। তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখতেন। তার পর বিভিন্ন আফগান সংগঠনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বিন লাদেনের এসব কাজ-কর্ম "সিআইএ" পাকিস্থানের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএস আই" এবং সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা "ইশতেকবরাতের" জানা ছিল। কিন্তু এদের সকলেই এগুলো দেখেও না দেখার ভান করে ছিল। তবে এদের কেউই বিন লাদেনকে আমেরিকান সাহায্য দেয়নি। কোনভাবেই না। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান শাহজাদা তুর্কী আল ফয়সাল হলেন বিন লাদেনের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। সে সময় তিনি এ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। "বায়তুল আনসার" কার্যালয়টি ছিল সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী সড়কের পাশে। এলাকাটি শান্ত, নিস্তরঙ্গ। চারদিকে বোগেইন ভিলার গাছ এবং স্থানীয় অভিজাতদের বড় বড় বাড়ি। আশির দশকের মাঝামাঝি এলাকাটি আফগান প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন সংগঠন সেখানে অফিস খুলে বসেছিল। ওখান থেকে দু'টো খবরের কাগজ বের হতো যার একটির প্রকাশক ছিলেন আব্দুল্লাহ অয্যাম ও বিন লাদেন। একটা নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ অফিসও ছিল ওখানে। অফিসটা ছিল বিন লাদেনের ভাড়া নেয়া একটা ভবন, যেখানে বসে মুজাহিদ সংগঠনের নেতারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের তাদের মতপার্থক্য দূর করতে পারতেন। ওখানকার পরিবেশ ছিল ক্লেশকর। আরাম-আয়েশের কোন ব্যবস্থাই ছিলনা ওখানে। অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বিন লাদেনসহ দশ-বারোজন স্বেচ্ছাসেবক মিলে একটা রুমে ঘুমাতেন। অফিস রুমের কঠিন মেঝেতে পাতলা তোশক বিছিয়ে শয্যা রচনা করা হতো। বিন লাদেন গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে বসে ইসলাম ও মধ্যপ্রচ্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন পর্যন্ত বিন লাদেনের মধ্য র‍্যা ডিক্যাল ভাবাদার্শ গড়ে ওঠেনি। বরং তাঁর তখনকার চিন্তাধারার মধ্যে খানিকটা ইতিহাসের স্মৃতি এবং খানিকটা চলমান ঘটনার ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণে মিশেল ছিল। বিন লাদেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরবদের সঙ্গে বৃটেনের বিশ্বাসঘাতকতায় বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ

ছিলেন। সৌদি রাজপরিবারের উপরও তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবং বলতেন যে ক্ষমতা করায়ত্ব করার জন্য তারা ওহাবীদেরকে কাজে লাগিয়েছে। বিন লাদেন স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ধর্মীয় বিতর্ক পরিচালনা করতেন। অনেক সময় বিতর্কের বিয়বস্তু হতো "সূরায়ে ইয়সিন"। ইসলামী ইতিহাসের বীর যোদ্ধাদের নিয়ে অনেক আলোচনা করতেন তিনি। সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কথা বলতেন। বলতেন অন্য বীরদের কাহিনী। এভাবে যেন তিনি নিজেই নিজেকে বৃহত্তর কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। ধর্মীয় অনুরাগ সুদানে নির্বাসিত জীবনযাপন শুরুর আগেই আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে বিন লাদেন অসমসাহসিকতার বেশ কিছু স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কট্টোরপন্থী সংগঠন হিজবে ইসলামীর এক নেতা জানান যে, তিনি নিজে দেখেছেন একবার সোভিয়েত সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হবার পর প্রচন্ড গোলাবর্ষণের মুখে বিন লাদেন কিভাবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। বর্তমানে বিন লাদেনের ঘোরবিরোধী এমন অনেকেও যোদ্ধা হিসাবে তাঁর বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ দিয়েছেন। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি যে আদৌ ভাবতেন না সে কথা তাঁদের সবাই উল্লেখ করেছেন। এভাবে একজন ধর্মপ্রাণ যুবক ক্রমান্বয়ে একজন সাচ্চা জিহাদীতে পরিণত হন। বিন লাদেনের ধর্মীয় অনুরাগ তার লোকদেরকেও প্রভাবিত করেছিল। ওসামার নিজের বর্ণিত একটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঘটনাটি ছিল ১৯৮৯ সালে পূর্বাঞ্চালীয় নগরী জালালাবাদ দখলের লড়াইয়ের সময়কার। ওসামার নিজের ভাষায়: "আমি তিনজন আফগান ও তিনজন আরবকে এনে একটা অবস্থান দখল করে রাখতে বললাম। তারা সারা দিন লড়াই চালাল। সন্ধ্যায় তাদের অব্যাহতি দেয়ার জন্য আমি ফিরে গেলে আরবরা কাঁদতে শুরু করে দিল। বলতে লাগল তারা শহীদ হতে চায়। আমি বললাম ওরা যদি এখানেই থেকে গিয়ে লড়াই চালিয়ে যায় তাহলে তাদের মনোবাঞ্ছনা পূরণ হতে পারে। পরদিন তারা সবাই শহীদ হল।" ওসামা পরে বলেন, তিনি তাদের বুঝিয়েছিলেন যে রণাঙ্গনের ট্রেঞ্চই হলো তাদের বেহেশতে যাবার পথ। সঙ্গী ও অনুসারীদের সাথে অনেক দিক দিয়ে নিজের কোন পার্থক্য রাখতেন না ওসামা বিন লাদেন। তিনি যে এত ধনী ছিলেন কিংবা একজন কমান্ডার ছিলেন অনেকেই তা জানত না। সবার সাথে বন্ধুর মতো একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতেন ও ঘুমাতেন তিনি। কখনও কখনও আফগানদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর জন্য নিজ উদ্যোগে সমঝোতার চেষ্টা চালাতেন। আফগান প্রতিরোধযুদ্ধে মুজাহিদ যোগান দেয়ার যে দায়িত্ব তিনি নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন তা অব্যাহত থাকে। সিআইএ সূত্রে হিসাব করে দেখা গেছে যে, জিহাদের জন্য আফগানিস্তানে বছরে তিনি ৫ কোটি ডলার সাহায্য নিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী এক যোদ্ধার কাছ থেকে জানা যায় জালালাবাদ দখলের লড়াই চলাকালে তিনি পথের পাশে ধূলি ধূসরিত বিন লাদেনকে মুজাহিদদের জন্য খাদ্য, কাপড়চোপড়, বুট জুতা প্রভৃতি সরবরাহের আয়োজন করতে দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো ইসলামী চিন্তাধারার অনুসারী যিনি নন তাঁর সঙ্গে বিন লাদেনের কিছুতেই বনিবনা হতো না। সৈয়দ মোহাম্মদ নামে আরেক আফগান মুজাহিদ জানান, একবার এক যুদ্ধে বিন লাদেন তাঁর সঙ্গে কোন রকম সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ শুধু একটাই- তিনি দাড়ি-গোফ সম্পূর্ণ কামানো ছিলেন। আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় বিন লাদেন মিডিয়ার শক্তিটা টের পেতে শুরু করেছিলেন।

আফগানযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার বিভিন্ন কাহিনী পেশোয়ারস্থ আরব সাংবাদিকদের হাত হয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর অনুকূল প্রভাব পড়ে। বন্যার ঢলের মতো দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এসে জড়ো হতে থাকে তাঁর পিছনে। তাঁর প্রতি লোকে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। এমন মর্যাদা এর আগে আর কখনও লাভ করেননি বিন লাদেন। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়। কাবুলে রেখে যায় এক পুতুল সরকার। আফগানিস্তানে এবার শুরু হয় নতুন লড়াই। সে লড়াই আফগানদের নিজেদের মধ্যে- মুজাহিদে মুজাহিদে লড়াই। এ অবস্থায় আরব আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের যুদ্ধে পোড়খাওয়া হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের আফগানিস্তানের মাটিতে পড়ে থাকার আর কোন কারণ ঘটেনি। তাদের অনেকেই জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আফগানিস্তান থেকে নিজ নিজ দেশে পাড়ি জমায়। আফগানদের এই ভ্রাতৃঘাতী লড়াই থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিন লাদেনও পাড়ি জমান নিজ দেশে। সত্যি বলতে কি, তিনি এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ লক্ষ্য করে অতিমাত্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। নিজে অতি সৎ, অতি বিশ্বস্ত মানুষ বিন লাদেন। আফগানদের আত্মকলহে লিপ্ত হতে দেখে তিনি অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেছিলেন। তিনি এ সময় তাদের বলেছিলেন যে সোভিয়েতের মতো একটা পরাশক্তিকে তাঁরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য করেছেন শুধু একটি কারণে- তাঁরা নিজেরা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ এবং তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়েছিল। একতাবদ্ধ না থাকলে এ বিজয় অর্জন তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এত বড় বিজয়ের পর আফগানদের নিজেদের মধ্যে নতুন করে রক্তক্ষরণ দেখে হতাশার গ্লানি নিয়ে বিন লাদেন ফিরে যান স্বদেশ সৌদি আরবে। তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর। সময়টা ১৯৯০- এর শরৎ। সৌদি আরবের প্রকৃত শাসক প্রিন্স আবদুল্লাহ যুবক ওসামা বিন লাদেনের কাঁধে তাঁর নরম থলথলে হাতটা রাখলেন। মৃদু হাসলেন। বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের কথা বললেন। তাঁর কথাগুলো মধুর শোনাচ্ছিল। তাঁর মধ্যে আপোসের সুর ছিল। তবে সন্দেহ নেই সেসব কথার আড়ালে লুকিয়ে ছিল কঠিন কঠোর হুমকি।

ওসামা বিন লাদেন আফগানযুদ্ধাভিজ্ঞ একজন আরব স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে রিয়াদে প্রিন্স আবদুল্লাহর সাথে তাঁর প্রাসাদে দেখা করতে এসেছিলেন। মনোরমভাবে সাজানো লাউঞ্জে আফগান ভেটারেনদের উদ্দেশ্যে প্রিন্স আবদুল্লাহ বললেন, "মোহাম্মদ বিন লাদেনের পরিবার বরাবরই আমাদের এই রাজ্যের বিশ্বস্ত প্রজা। প্রয়োজনের সময় এই পরিবার আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, কাউকে এমন কিছু করতে দেয়া হবে না যাতে আমাদের এই সুসম্পর্ক ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।" উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ প্রিন্স আবদুল্লাহর কথায় শ্রদ্ধাবনতভাবে মাথা নেড়েছিল। কিন্তু যার উদ্দেশে কথাগুলো উচ্চারিত হয় সেই বিন লাদেন তাঁর অবদমিত ক্রোধ ভিতরেই চেপে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছিলেন। বস্তুতপক্ষে আবদুল্লাহর কথায় তিনি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, সেটা তাঁর চোখমুখের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবদুল্লাহর কথায় তিনি অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেদিন।

মিসরীয় সহকর্মীদের কাছ থেকে একটা জিনিস শিখেছিলেন বিন লাদেন। তা হলো, আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্বোত্তম কৌশল। তাদের এই পরামর্শ মতো তিনি কাজ করেছিলেন। তোরাবোরা ঘাঁটিতে দু'মাস কাটানোর পর বিন লাদেন বারো পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ লিখেন ও বিলি করেন। তাতে কুরআন ও ইতিহাস থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি ও প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছিল। এবং অঙ্গিকার করা হয়েছিল যে, আমেরিকানরা সৌদি আরব থেকে সরে না গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। নিবন্ধে প্রথমবারের মতো তিনি ফিলিস্তিন ও লেবাননের পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ইহুদী খৃস্টানদের হিংসার অপপ্রচারের উল্লেখ করে বলেন, তাদের এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। এ ধরনের অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়ভাবে প্রসারিত হয়। এর পিছনে মিসরীয়দের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। আফগান মুজাহিদদের সিআইএ বেশ কিছু স্ট্রিংগার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়েছিল।

বিন লাদেন তাদের কাছ থেকে চারটি স্ট্রিংগার কিনে নিয়ে সৌদি ইসলামী গ্রুপগুলোর কাছে গোপনে পাচার করেন। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে রিয়াদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়। পাকিস্তানের মতো সৌদি আরবও আফগানিস্তানে রাশিয়া ও ইরানের প্রভাব খর্ব করার জন্য তালেবানদের সাহায্য সমর্থন দিয়েছিল। এখন সেই তালেবানরাই সৌদিদের ঘোরতর এক শত্রুকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাকে সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের দাবি অগ্রাহ্য করেছে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে অনুভব করছে সৌদি আরব। ১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে তালেবানরা বিন লাদেনকে হত্যার একটি সৌদি ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে। আফগানিস্তানের তখন প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এলাকা এই মুজাহিদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। হত্যা ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হবার পর তালেবানরা বিন লাদেনকে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য কান্দাহারে চলে যেতে বলে। বিন লাদেন রাজি হন এবং কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছাকাছি সোভিয়েত বিমানবাহিনীর একটি পুরনো ঘাঁটিতে চলে যান। ইতোমধ্যে বিপুল পরিমাণ সামরিক সাজসরঞ্জাম কেনার অর্থ যুগিয়ে, মসজিদ তৈরি করে এবং নেতৃবৃন্দকে গাড়ি কিনে দিয়ে বিন লাদেন তালেবান হাই কমান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। তিনি কান্দাহার নগরীর উপকণ্ঠে মোল্লা ওমর ও তাঁর পরিবারের জন্য একটি নতুন বাসভবনও তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিন লাদেন আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো থেকে সেরা শিক্ষার্থীদের আল-কায়েদায় নিয়ে নেয়ার একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রশাসকরা স্বেচ্ছাসেবকদের বলত যে, তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবেন তাঁদের 'আমীরের' সামনে হাজির করা হবে। আমীর বিন লাদেনের সামনে হাজির করার পর তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে চৌকশ ও প্রতিভাবান যুবকদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য বেছে নেয়া হতো। এই বিশেষ শিবিরে তাদের পদাতিক বাহিনীর মৌলিক কলাকৌশল শিখানো হতো না বরং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নেয়া হতো। যুদ্ধের মহড়ার আয়োজন করা হতো এবং পরিশেষে আধুনিক জিহাদের দক্ষতা ও কৌশল শিখানো হতো। এক বছরের মধ্যে বিন লাদেন মুজাহিদদের একটি বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলেন। ডা. আইমান আল জাওয়াহিরির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিন লাদেন এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যে উদ্দেশ্যের জন্য লড়ছেন সেটাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা দরকার।

১৯৯৭ সালের শেষদিকে তিনি ইসলামী সংগঠনগুলোকে আল কায়েদার ছত্রছায়ায় একতাবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন। তিনি সারা বিশ্বের মুসলিম নেতাদের একই উদ্দেশ্যের পিছনে টেনে আনার জন্য নিজের অর্থবিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবকিছুই কাজে লাগিয়েছিলেন। স্থানীয় পর্যায়ের ইসলামী আন্দোলনগুলোর প্রতি তিনি তাঁর সাহায্য-সমর্থন জোরদার করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য গ্রামের ইমাম আলেমদের হাতে টাকা দেন। তালেবান সূত্রে জানা যায় যে, দুবাই থেকে তিনি তিন হাজার সেকেন্ডহ্যান্ড টয়োটা করোলা গাড়ি আমদানির ব্যবস্থা করেন। জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা হিসাবে এই গাড়িগুলো যুদ্ধে শহীদ তালেবানদের পরিবারের হাতে দেয়া হয়।

পরিশেষে ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিন লাদেন 'বিশ্বজিহাদ ফ্রন্ট' এর নামে ইহুদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এক ফতওয়া জারী করেন। বিন লাদেন, আল জাওয়াহিরি এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ইসলামী আন্দোলনের নেতারা ফতওয়ায় স্বাক্ষর দেন। এবং গোটা অঞ্চলের ডজনখানেক সংগঠন ফতওয়া অনুমোদন করে। পাশ্চাত্যের ইসলাম সম্পর্কিত এক বিশেষজ্ঞের মতে ফতওয়াটি ছিল অলঙ্কারপূর্ণ আরবী গদ্যের এক অপরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত। এমনকি ওটাকে অসাধারণ কাব্যিকও বলা যায়। অবশ্য এর বক্তব্য বিষয়টা মোটেও কাব্যিক ছিল না। কারণ ফতওয়ায় বলা হয়েছিল যে, আমেরিকান ও তাদের মিত্রদের- এমনকি তারা যদি অসামরিক ব্যক্তিও হয় তাহলেও তাদের হত্যা করা মুসলমানদের দায়িত্ব। এর অল্পদিন পরই এক সাক্ষাতকারে বিন লাদেন বলেন যে, খবু শীঘ্রই র‌্যা ডিকেল কার্যক্রম শুরু হবে। সেটা শুরু হলো ১৯৯৮ সালের সাত আগস্ট। ঐ দিন সকাল এগারো'টায় মুহাম্মাদ রশিদ দাউদ আল-ওহালী নামে ২২ বছরের এক সৌদি যুবক নাইরোবি শহরতলীর এক হাসপাতালের নিচ তলায় পুরুষদের একটি টয়লেটে দাঁড়ানো ছিল। যুবকটির মুখে দাড়ি। শীর্ণ কাঁধ। এক সেট চাবি ছিল তার হাতে এবং তিনটি বুলেট।

যুবকটির পরনে ছিল জিনসের প্যান্ট, একটা সাদা রঙের কারুকাজ করা শার্ট। পায়ে মোজা ও কালো জুতা। তাঁর পোশাকে রক্তের দাগ ছিল। হাতে যে চাবিগুলো ছিল সেগুলো একটি হালকা বাদামী রঙের টয়োটা পিকাপ ট্রাকের পিছনের দরজার চাবি। ৩৪ মিনিট আগে গাড়িটি এক প্রচ- বিস্ফোরণে উড়ে যায়।

বিস্ফোরিত বোমাটি ঐ গাড়ির ভিতরেই রাখা ছিল। বিস্ফোরণে মার্কিন দূতাবাস, একটি অফিস ব্লক এবং একটি সেক্রেটারিয়ান কলেজ বিধ্বস্ত হয়। নিহত হয় ২১৩ জন। আহত হয় ৪৬০ জন। প্রায় একই সময় তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে দ্বিতীয় একটি বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ১১ জন। আল ওহালীর ট্রাকের ড্রাইভার ছিল আযযাম নামে আরেক সৌদি যুবক। বিস্ফোরণে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারা দু'জন টয়োটা ট্রাকটি নিয়ে সবেগে দূতাবাসে ঢুকে পড়ার সময় শাহাদাতবরণের আরবী গান গাইছিল। যদিও সে সময় তাঁরা ভেবেছিল যে, দু'জন একত্রে মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় না। চালকের আসনে বসা আযযাম ড্যাশবোর্ডর সঙ্গে টেপদিয়ে আটকানো ডেটোনেটরের বোতামে চাপ দেয়ার সাথে সাথে বিষ্ফোরণে তার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আল

ওহালি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে তিনি এফবিআই কে জানান যে, ১৯৯৭ সালের প্রথম ভাগে আফগানিস্তানে ট্রেনিং নেয়ার সময় তাকে বেছেনিয়ে ছিলেন ওসামা বিন লাদেন। এরপর তাকে সে বছরের গ্রীষ্মে তালেবানদের পক্ষে লড়াই করার জন্য পাঠানো হয়। অতপর তাঁকে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে আল কায়েদার ইন্সট্রাক্টরদের হাতে জিহাদের উপর বিশেষ ধরণের ট্রেনিং নিতে পাঠানো হয়। পরিশেষে এপ্রিল মাসে তাকে নাইরোবিতে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার মিশনে নিয়োগ করা হয়। আয্যাম ও একই পথ অনুসরণ করেছিল। আফ্রিকায় বোমা বাজির দুটো ঘটনার তেরো দিন পর ৭৫ টি মার্কিন ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলিয় পার্বত্য এলাকার ছয়টি প্রশিক্ষণ শিবিরে আঘাত হানে। অপর ক্ষেপনাস্ত্রগুলো সুদানের একটি মেডিকেল কারখানা ধ্বংশ করে দেয়। মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে যায়। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয়ে আবির্ভূত হন ওসামা বিন লাদেন।

বিশ্বময় জিহাদিদের অবাধ বিচরণ। জিহাদের পদচারণা থেকে কোন রাষ্ট্র, কোন অঞ্চলই যেন বাকি নেই। মহা প্ররাক্রান্ত আমেরিকার মাটিও নয়। ইতোমধ্যে বলকান অঞ্চল থেকে আফগানিস্তান হয়ে ফিলিপিন্স পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এক নতুন ধরণের জিহাদ। বিশ্ব কট্টরপন্থী মুসলিমদের জিহাদ। সেই জিহাদের প্রাণ পুরুষ আজ ওসামা বিন লাদেন। তার গুপ্ত বাহিনীর সদস্যরা ছড়িয়ে আছে বিশ্বের দেশে দেশে। জিহাদ চালানোর জন্য তারা তৎপর রয়েছে বসনিয়া, আলবেনিয়া, কাশ্মিরে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বিন লাদেন হয়ে দাঁড়িয়েছেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত পুরুষ। আমেরিকার বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন সর্বাত্মক যুদ্ধ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের ঘাঁটিতে ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র হেনে লাদেনকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। পারেনি! পারেনি! এখন জীবিত হোক, মৃত হোক তাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। আমেরিকা লাদেনের মাথার দাম ঘোষণা করেছে ৫০ লাখ ডলার। কিন্তু লাদেন যেন প্রহেলিকা। তাকে ধরা যায় না-ছোঁয়া যায় না। বিশ্বজুড়ে লাদেন বাহিনীর জিহাদী কর্মকান্ডের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ১৯৯৮ সালের আগষ্টে নাইরোবি ও দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসের বাইরে যুগপত বোমা বিস্ফোরণ তার অন্যতম। এ বছর প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের বাংলাদেশ সফর কালে জয়পুরা গ্রাম পরিদর্শনের কর্মসূচি শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ নাকি গোপন সূত্রে খবর পায় যে, লাদেন বাহিনী চোরাগোপ্তা আঘাত হানতে পারে।কে এই ওসামা বিন লাদেন? কিভাবে কোন পটভূমি থেকে ঘটল তার উত্থান? কেমন করেই বা চালিত হয় তার গুপ্ত বাহিনীর কর্মকা-? তিনি কি পথভ্রষ্ট কোন সন্ত্রাসী মাত্র? নাকি নিশির মতো ঘোরে পাওয়া এক সৌদি বিলিওনেয়ার যিনি ঐশ্বর্য ও বিলাসী জীবন ছেড়ে সুদূর আফগাস্তিানের এক গুহায় বসে জাল বুনে চলেছেন তার বিশ্ব পরিকল্পনার? ইয়োসেফ বাদানস্কির ‘বিন লাদেন॥ দি ম্যান হু ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার অন আমেরিকা’ গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে এখানে পরিবেশিত হচ্ছে সেই বহুল আলোচিত মানুষটির বিচিত্র কাহিনী।

## প্রথম জিবন

ওসামা বিন লাদেন। শীর্ণ একহারা গড়ন। শশ্রুমন্ডিত চেহারা। বয়স ৪৩ এর মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এই মানুষটির কম্পিউটারের ওপর ভাল দখল আছে। চার স্ত্রী ও ১৫টির মতো ছেলেমেয়ে। তাদের নিয়ে বসবাস

করছেন আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের একটি গিরিগুহায়। সেখানে ট্যাপের পানি সেই। শীতের হিংস্র ছোবল থেকে বাঁচবার জন্য গুহাটিকে গরম রাখার কোনরকম ব্যবস্থা আছে মাত্র। আর সেই সঙ্গে আছে গুপ্তহত্যা, কমান্ডো আক্রমণ ও বিমান হামলার আশঙ্কা। এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয় লাদেনকে। অথচ এমনি ঝুঁকিময়, বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত জীবন যাপন করার কথা ছিলো না লাদেনের। বাবার পথ ধরে তিনি হতে পারতেন সৌদি আরবের একজন নামী নির্মাণ ঠিকাদার। হতে পারতেন একজন ধনকুবের, যার ব্যংক ব্যালেন্স থাকত শত শত কোটি  ডলারের। অথচ তিনি প্রাচুর্যের জীবন ছেড়ে বেছে নিয়েছেন এক বন্ধুর পথ। অত্যন্ত কঠিন পরিবেশে থেকে তিনি নিজেকে উৎসর্গিত করেছেন এমন এক মিশনে যার নাম তিনি দিয়েছেন ‘জেহাদ’। জিহাদের জন্য উজ্জ্বল ক্যারিয়ার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন পরিত্যাগ করেছেন এমন মানুষ অবশ্য বিন লাদেন একা নন, আরও অনেকেই আছেন। তাদের একজন ডা. আইমান আল জাওয়াহিরি। ইনি লাদেনের দক্ষিণ হস্ত। চল্লিশের শেষ কোটায় বয়স। মিসরের অন্যতম শীর্ষ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞহতে পারতেন তিনি। কিন্তু বিপুল সম্ভামনাময় ক্যারিয়ার ও প্রচুর্যের জীবন ছেড়ে তিনি মিসর সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য হন। লোভনীয় পারিশ্রমিকে তাকে পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। লাদেন ও জাওয়াহিরী আজ পাশ্চাত্যের চোখে সবচেয়ে কুখ্যাত মুসলিম জিহাদী নেতা। তবে তাঁরাই একমাত্র নন। এঁদের মতো আরও শত শত অধিনায়ক আছেন এবং তাদেরও প্রত্যেকের অধীনে আছে হাজার হাজার জিহাদী। এঁরা সবাই যুক্তরাষ্ট তথা গোটা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন ‘জিহাদে’ লিপ্ত। ১৯৯৮ সালের আগস্টে কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ তাদের সর্বশেষ বড় ধরণের জিহাদী হামলার দৃষ্টান্ত। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই নব্য র‌্যাডিকেল ইসলামী এলিটদের আবির্ভাব উন্নয়নশীল বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনা। সধারণত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও বিক্ষুব্ধ অংশ থেকে সন্ত্রাসবাদী ও র‌্যাডিকেলরা জন্ম নিলেও এই  নেতারা এসব শ্রেণী থেকে আসেননি, এসেছেন বিত্তবান ও বিশেষ সুবিধাভোগী অংশ থেকে। এঁরা শুধু উচ্চ শিক্ষিতই নন, পাশ্চাত্যের মননশীলতার দ্বারাও প্রভাবিত। ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীদের থেকেও তাঁরা আলাদা। ওসামা বিন লাদেন, আইমান আল জাওয়াহিরি এবং তাঁদের সত্তর ও আশির দশকের টালমাটালময় সময়ের ফসল।

বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে তাদের জিহাদী রাজনীতি র‌্যাডিকেলিজমকে আলিঙ্গন করার ব্যাপারটা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলো হলো সত্তরের দশকে তেলের মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে একই সঙ্গে আরব জাতির সমৃদ্ধি ও সত্তার সঙ্কট, ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় এবং আশির দশকের আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী সংগ্রাম। ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন লাদেনের জন্ম সম্ভবত ১৯৫৭ সালে সৌদি আরবের রিয়াদ নগরীতে। বাবা মুহাম্মদ বিন লাদেন তখন ছিলেন ছোটখাটো একজন ঠিকাদার। ভাগ্যের সন্ধানে তিনি ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবে আসেন। মোহাম্মদ বিন লাদেনের স্ত্রী ছিল বেশ কয়েকটি, সন্তান সংখ্যা ৫০-এরও বেশি। এদেরই একজন বিন লাদেন। মোহাম্মদ বিন লাদেন শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বলে সন্তানদের শিক্ষাদানে কার্পণ্য করেননি। ষাটের দশকে তার পরিবার সৌদি আরবের

পশ্চিমাঞ্চলে হিজাজে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মদিনায় বসতি স্থাপন করে। ওসামা বিন লাদেন তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বেশিরভাগই পেয়েছিলেন মদিনায় ও পরবর্তীকালে জেদ্দায়।

সত্তরের দশকে তেল সঙ্কটকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর বিপুল আর্থোপার্জন মোহাম্মদ বিন লাদেনের ভাগ্যের চাকা বদলে দেয়। হিজাজে উন্নয়নের জোয়ার বইতে থাকে এবং সেই সাথে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে লাদেনের নির্মাণ ব্যবসা। এই নির্মাণ ব্যবসার সূত্রেই সৌদি এলিটদের সঙ্গে সরাসরি যোগযোগ ঘটেছিল তার। অচিরেই আল-সৌদ পরিবারের সবচেয়ে উঁচু মহলের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। নির্মাণ কাজে তিনি শুধু উৎকর্ষ ও উন্নত রুচিই এনে দেননি, আভিজাত্যও সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সঙ্গে আল-সৌদ পরিবারকে গোপন কিছু সার্ভিসও দিতেন তিনি। তার মধ্যে একটি ছিল বিভিন্ন স্থানে অর্থ প্রেরণ। শীর্ষ মহলের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগে মোহাম্মদ বিন লাদেন তার ব্যবসায়কে সম্প্রসারিত করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ নির্মাণ কোম্পানিতে পরিণত করেন এবং তার নাম দেন বিন লাদেন কর্পোরেশন। আল-সৌদ পরিবার লাদেনের কোম্পানিকে মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদ নবরূপায়ন ও পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব দেন। এতে কোম্পানির মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। সত্তরের দশকে বিন লাদেন কোম্পানি উপসাগরীয় অঞ্চলের বেশ কয়েকটি আরব দেশের রাস্তাঘাট, ভবন, মসজিদ, বিমানবন্দরসহ গোটা অবকাঠামো নির্মাণে জড়িত হয়ে পড়ে।ওসামা বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন এ যেন কথাই ছিল। প্রথমে তিনি জেদ্দার হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে সেখানকার কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির ওপর অধ্যয়ন করেন। বাবা কথা দেন ওসামাকে তার কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন। রাজ দরবারের সাথে বিন লাদেনের সরাসরি যোগাযোগ আছে। সেই যোগাযোগের সুযোগে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কনট্রাক্টগুলো বাগিয়ে আনতে পারবে তার কোম্পানি। ওসমার সত্তরের দশকটা আর দশটা বিত্তবান ও প্রভাবশালী সন্তানদের মতোই শুরু হয়েছিল। সৌদি আরবের কঠোর ইসলামী জীবনধারার বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে তিনি প্রমোদ ভ্রমণে যেতেন কসমোপলিটন বৈরুতে। হাই স্কুল ও কলেজে পড়তেই তার বৈরুতে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল।

## বিন লাদেনের ভাব পুরুষ

ভোগ বিলাসের উপকরণ বেশি আকর্ষণ করতে পারেনি বিন লাদেনকে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের পর থেকে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। তখনও মাঝে মধ্যে প্রমোদ ভ্রমণে বৈরুত যেতেন বটে, তবে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাতে থাকেন। ইসলামী বইপত্র পড়া তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এবং আলেম ওলামাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। ওসামার জীবনে এই পরিবর্তনটা আসলে ছিল সত্তরের দশকের আরব ও মধ্য প্রাচ্যের অস্থির সময়ের প্রতিফলন। এই অস্থির সময়ের একটি ফসল ছিল র‍্যাডিকেল ইসলামী চিন্তাধারা।সে সময় র্যাডিকেল ভাবধারার অন্যতম পাঠ্যস্থান ছিল জেদ্দা নগরী। জেদ্দা বন্দর দিয়ে সৌদি আরবে পণ্য আনা নেয়ার পাশাপাশি মিসর ও অন্যান্য দেশ থেকে র‍্যাডিকেল ইসলামী প্রচার পুস্তিকা ঢালাওভাবে চলে আসত। তা ছাড়া জেদ্দার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলর‍্যর‍্যাডিকেল ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের কর্মকান্ডে মুখর হয়ে উঠেছিল। বিন লাদেনসহ জেদ্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এই র‍্যাডিকেল ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি

ও কর্মকান্ডের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী পর্যায়ে মিশর র‌্যাডিকেল আন্দোলনের জোয়ার, ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানের শাহের বিরুদ্ধে ইসলামী শক্তির বিজয় এবং খোদ সৌদি আরবে র‌্যাডিকেল শক্তির অভ্যুত্থান চেষ্টা (কাবার মসজিদুল হারাম দখলের ঘটনা) বিন লাদেনের মতো তরুণদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে। এরপর ঘটে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন। আগ্রাসনের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই রুশ দখলদারীর বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় মুজাহিদ বাহিনীর তৎপরতা। আমেরিকা ও সৌদি আরব পাকিস্তানের মাধ্যমে মুজাহিদদের অস্ত্র, রসদ, অর্থসহ যাবতীয় সাহায্য যোগাতে থাকে। সোভিয়েত হামলার পর মুজাহিদদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়বার জন্য প্রথম যে ক'জন আরব আফগানিস্তানের গিয়েছিল ওসামা বিন লাদেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বলা যেতে পারে যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হামলা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিন লাদেন আফগানিস্তানের পথে প্রথমে পাকিস্তানে যান। সেখানে পৌঁছে আফগান মুজাহিদদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য দেখে হতবাক হয়ে যান। অবশেষে নিজেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করে আফগান যুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ অভিযানে নেমে পড়েন। বিন লাদেন এ কাজের জন্য যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন পরবর্তী কয়েক বছরে তাঁর মাধ্যমে উপসাগরীয় দেশগুলোর হাজার হাজার আরব যোদ্ধা আফগানিস্তানে পৌঁছে।

আফগানিস্তানে অবস্থানের প্রথমদিকে শেখ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আয্যাম নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। 'ইন্টারন্যাশনাল লিজিয়ন অব ইসলাম' নামে আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদের অতি দক্ষ ও জানবায একটি হার্টকোর বাহিনী প্রতিষ্ঠায় আয্যামই ছিলেন আসল ব্যক্তি। আয্যাম প্রসঙ্গে এখানে দুটো কথা না বললেই নয়। কারণ প্রকৃত অর্থে এই মানুষটি ছিলেন বিন লাদেনের ভাব পুরুষ। আয্যামের জন্ম ১৯৪১ সালে সামাবিয়ার জেনিন শহরের কাছে এক গ্রামে। ১৯৭৩ সালে তিনি মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের ওপর পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। মধ্যবর্তী সময়টিতে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। কায়রোয় থাকাকালে তিনি ইসলামী জিহাদীদের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় বেশকিছু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে যাঁরা পরবর্তীকালে আফগানিস্তানে বড় ধরনের প্রভাব রেখেছিলেন।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি আয্যাম ফিলিস্তিনী সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই যুক্তিতে যে, এই সংগ্রাম ইসলামী জিহাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়ে জাতীয় বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা চালিত হচ্ছে। সম্পর্ক ছিন্ন করার পর আয্যাম জেদ্দায় গিয়ে কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ওসামা বিন লাদেন তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। লাদেন আয্যামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন প্রমাণের অভাব নেই। জেদ্দায় আয্যাম তাঁর এই মতবাদ দাঁড় করান যে, পাশ্চাত্যের অশুভ প্রভাব থেকে মুসলিম বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য 'জিহাদ' শুধু অপরিহার্যই নয়, এটাই একমাত্র পথ। ১৯৮০ সালে আয্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে যান। তবে আফগান যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পাকিস্তানী ও আফগান নেতারা তাঁকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ না নিয়ে শিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী তাঁকে ইসলামাবাদের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির লেকচারার নিয়োগ করা হয়। আয্যাম সে চাকরিতে যোগ না দিয়ে আফগান সীমান্তের কাছে পেশোয়ারে চলে যান। এবং আফগান জিহাদের পিছনে তাঁর সময় ও শক্তির পুরোটাই উৎসর্গ করেন। সেখানে তিনি বায়তুল আনসার নামে একটি শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। 'বায়তুল আনসার' আফগান জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য পাকিস্তানে আগত প্রথম ইসলামী স্বেচ্ছাসেবক দলটিকে গ্রহণ করে ও ট্রেনিং দেয়। এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিন লাদেনও ইসলামী আন্তর্জাতিক জিহাদী ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যান। এবং আয্যামের ঘনিষ্ঠতম একজন শিষ্য হয়ে

দাঁড়ান।শেখ আয্যামের ছিল শিক্ষা, ভাবধারা ও চিন্তাশক্তি। আর বিন লাদেনের ছিল অর্থবিত্ত, জ্ঞান ও কর্মোদ্যম। আয্যামের ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেন লাদেন। আয্যাম ও লাদেন মিলে প্রতিষ্ঠা করেন মাকতাব-আল খিদমাহ বা মুজাহিদীন সার্ভিস ব্যুরো। লাদেন অচিরেই এই ব্যুরোকে একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে রূপান্তরিত করেন। যার কাজ হলো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে সাধারণ থেকে সর্বস্তরের জ্ঞানসম্পন্ন ইসলামপন্থীদের খুঁজে বের করা এবং আফগানিস্তানে বিভিন্ন কাজে তাদের রিক্রুট করা।

১৯৮০-র দশকের শেষভাগ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র, মিসর, সৌদি আরব ও কয়েকটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসহ ৫০টি দেশে বিন লাদেনের ঐ আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের শাখা ও রিক্রুটমেন্ট কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে যায়। আফগান যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক আরবের আগমণ ঘটেছিল। তাদের গ্রহণ করে ফ্রন্টে পাঠাতে গিয়ে বিন লাদেন লক্ষ্য করেন যে, আফগানিস্তানের বন্ধুর পরিবেশের মুখোমুখি হওয়ার আগে এই আরবদের উপযুক্ত ট্রেনিং দেয়া ও পরিবেশের সঙ্গে ধাতস্ত করে নেয়া দরকার। সেটা বিবেচনা করেই আয্যাম ও বিন লাদেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তান উভয় স্থানে মাসাদাত-আল আনসার স্থাপন করেন। আরব মুজাহিদদের জন্য এটা এমন এক কেন্দ্রীয় ঘাঁটি হিসাবে কাজ করবে যেখানে স্বদেশের বাইরে থেকেও স্বদেশের পরিবেশ পাওয়া যাবে। এসব কার্যক্রম চালাতে গিয়ে বিন লাদেন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে অসংখ্য জিহাদ পন্থী মুসলিম ও মুজাহিদের সঙ্গে যোগযোগ স্থাপন করেন, যা পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদ পরিচলনার সহায়ক হয়েছে।

সোভিয়েত ও আফগান সরকারের আর্টিলারি বাহিনীর মুখে মুজাহিদদের অবস্থা খুবই নাজুক- এ দিকটার কথা চিন্তা করে বিন লাদেন সৌদি আরব থেকে ভারি প্রকৌশল সরঞ্জাম নিয়ে আসেন। সড়ক নির্মাণ ত্বরান্বিত করা এবং মুজাহিদদের জন্য স্থাপনা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি তার পরিবারের কিছু বুলডোজার আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এরপর সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর বেশকিছু কোম্পানির কাছ থেকে নানা ধরনের ভারি সরঞ্জাম আনার ব্যবস্থা করেন। এগুলোর সাহায্যে মুজাহিদদের জন্য ভূগর্ভে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছিল। আশ্রয়স্থল বানানো হয়েছিল। এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে সামরিক সাহায্য আসতে থাকায় বিন লাদেন আফগান, পাকিস্তানী ও আরব মুজাহদীদের ভারি প্রকৌশল সরঞ্জাম ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি আফগানিস্তানের পূবাঞ্চলে মুজাহিদদের জন্য এক সুরক্ষিত ঘাঁটি গড়ে তোলার কাজে হাত দেন- যেখানে সড়ক,সুড়ঙ্গ পথ, হাসপাতাল ও গুদাম সবই থাকবে।

আফগান যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মিসর থেকেও বিপুলসংখ্যক মুজাহিদ সে দেশে পাড়ি জমায়। সেখানে তারা নিজেদের তৎপরতা চালোনোর জন্য একটা নিরাপদ ঘাঁটি খুজে পায়। আফগানিস্তানে আগত প্রথম দিকের মিসরীয়দের একটি অংশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আহমদ শাকি আল ইসলামবুলি। ইনি বর্তমানে বিন লাদেনের সিনিয়র মুজাহিদ কমান্ডারদের একজন। তার আরও একটি পরিচয় আছে যা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা হলো ১৯৮১ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট সাদাত যার হাতে নিহত হয়েছিলেন সেই খালিদ আল ইসলামবুলি তার ভাই। মিসরের শুদ্ধি অভিযানের পর থেকেই তারা পালাতক ছিলেন। আফগানিস্তানে গিয়ে তারা অচিরেই একটি সুসংবদ্ধ আরব বিপ্লবী দল গড়ে তোলে। আর এই দলটি আজ পর্যন্ত বিন লাদেনের অতি বিশ্বস্ত কমান্ডার ও সৈনিকদের হার্ডকোর অংশ। ১৯৮৩ সালে শাকি আল ইসলামবুলি করাচীতে গিয়ে মিসর থেকে লোক ও অস্ত্র আনা নেয়ার একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। নেটওয়ার্কটা এখনও চালু আছে।

১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে ওসামা বিন লাদেন মুজাহিদদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার এবং স্বেচ্ছাসেবক রিক্রুট করে আফগানিস্তানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে স্বদেশে ফিরে যান। সেই লক্ষে তিনি সৌদি শাসক গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ মহলের সঙ্গে তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগকে কাজে লাগাতে ভোলেননি। অচিরেই বাদশা ফাহাদের ভাই প্রিন্স সালমান, সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান প্রিন্স তুর্কি আল ফয়সল ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে তার যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

### *সৌদিদের স্বার্থোদ্ধারে বিন লাদেন*

বিন লাদেন যখন আফগান যুদ্ধে বিভিন্ন মহলের সাহায্য সহযোগিতা সংগ্রহে ব্যস্ত সৌদি আরব তখন এই তরুণ মুজাহিদ নেতাকে নিয়ে ভাবছিল অন্যকথা। সে সময় আরব উপদ্বীপ মস্কোপন্থী বিভিন্ন দেশের বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত বা ঘেরাও হয়ে পড়তে পারে এমন ধারণা সৌদিদের শঙ্কিত করে তুলেছিল। তৎকালীন সোভিয়েত প্রভাববলয়ের দেশ দক্ষিণ ইয়েমেনে এবং লোহিত সাগর তীরবর্তী আফ্রিকা শৃঙ্গে সোভিয়েত,পূর্ব জার্মানি ও কিউবার সামরিক উপস্থিতি ক্রমাগত বেড়ে চললে সৌদি আরব রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সৌদিরা আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রতি বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করে চললেও তাদের মাথায় অন্য চিন্তা খেলতে থাকে।

সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ইয়েমেনে এডেনের শেষ সুলতান তারিক আল-ফাদলির নেতৃত্বে গোপনে গোপনে এক ইসলামী বিদ্রোহের আয়োজন করা হয়। কমিউনিস্টবিরোধী এই বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ওসামা বিন লাদেনকে "সেচ্ছাসেবক" মুজাহিদ ইউনিট গঠন করতে বলা হয়। এই কাজের জন্য পুরো আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল রিয়াদ এবং এর পিছনে সৌদি রাজ দরবারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদ ছিল। বিন লাদেন আফগানিস্তানে যেতে ইচ্ছুক নানা শ্রেণীর ইসলামী সেচ্ছাসেবী এবং সৌদি হোয়াইট গার্ডস-এর বিশেষ বাহিনী (এদের আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটি দেয়া হয়েছিল সদস্যদের নিয়ে "স্ট্রাইক ফোর্স" বা আক্রমণকারী বাহিনী গঠন করেন। দক্ষিণ ইয়েমেনে বিদ্রোহীদের এই লাড়াইয়ে বিন লাদেন এতখানি জড়িয়ে পড়েন যে, দক্ষিণ ইয়েমেনী বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে তিনি সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু যতই উৎসাহ থাকুক এই কমিউনিস্টবিরোধী জিহাদ খুব একটা বিকাশ লাভ করতে পারেনি। তেমন কোন সাফল্য দেখতে না পেয়ে রিয়াদ শেষ পর্যন্ত গোটা কার্যক্রম থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তবে বিন লাদেনের এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। ইতিমধ্যে সাবেক সুলতান তারিক আল-ফাদলি যিনি তখন সানরা নির্বাসিত ছিলেন, তার সাথে বিন লাদেনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ঘনিষ্টতার কারণেই বিন লাদেন নব্বইয়ের দশকে তারিক আল ফাদলি ও অন্যান্য ইয়েমেনী মুজাহিদ কমান্ডারের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

ওদিকে দক্ষিণ ইয়েমেনে বিশেষ অভিযানে ওসামার ভূমিকায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন সৌদি নেতৃবৃন্দ। তারা তাকে আকর্ষণীয় কনট্রাক্ট দিয়ে খুশি করতে চাইলেন। আশির দশকের প্রথমদিকে মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কাজটা ওসামার বাবা মোহাম্মদ বিন লাদেনের কোম্পানিরই পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওসামাকে সম্মানিত করার জন্য বাদশাহ ফাহাদ মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণের কনট্রাকটি নিজের হাতে তাকে দেন। ওসামাকে জানানো হয় যে, শুধু এই কনট্রাক্ট থেকেই তার নিট ৯ কোটি ডলার মুনাফা হবে। শোনা যায় যে, বাদশাহ ফাহাদের সঙ্গে সেই সাক্ষাতকারে ওসামা

কনট্রাক্টের অফার সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার পরিবর্তে আফগান জিহাদে আরও ব্যাপক পরিসরে সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার জন্য বাদশাহর প্রতি আহ্বান জানান। বাদশাহ ফাহাদ, যুবরাজ আব্দুল্লাহ ও শাহজাদা তুর্কী সৌদি আরবের জন্য আফগান পরিস্থিতির স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব সম্পর্কে আগে থেকেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। বিন লাদেনের আহ্বান তাদের মনে যে বেশ দাগ কেটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কনট্রাক্টটি প্রত্যাখ্যান করায় ওসামার তেমন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। কারণ শেষ পর্যন্ত ওটা তার বাবাই পেয়েছিলেন। ওসামা পরে আফগানিস্তানে তার বিশ্বস্তজনদের বলেছেন, জিহাদের পিছনে তিনি যত অর্থ ব্যয় করেছেন তার সাথে তার ব্যবসাও প্রসারিত হয়েছে, সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আফগানদের সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের প্রভাব মুসলিম বিশ্বের ওপর সত্যিকার অর্থে পড়তে শুরু করে আশির দশকের মাঝামাঝি নাগাদ। মূলত এটা প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা এবং ওসামা বিন লাদেনের কর্মতৎপরতার ফলেই সম্ভব হয়। তার আগ পর্যন্ত আরব ইসলামপন্থীরা নিজ নিজ সরকারের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যস্ত থাকায় আফগানিস্তানের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিল। ১৯৮৫ সালে শত শত আরব আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করে। এদের বেশির ভাগই ছিল জিহাদ পন্থী মুসলিম। আশির দশকের প্রথমদিকে আফগানিস্তনে আরবদের সংখ্যা যেখানে ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার সেখানে আশির দশকের মাঝামাঝি ১৬ হাজার থেকে ২০ হাজার আরব শুধু হিজবে ইসলামী পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। আরব ইসলামী সংগঠনগুলো জিহাদের ওপর অধ্যয়ন ও চর্চার জন্য তাদের কতিপয় কমান্ডারকে আফগানিস্তানে পাঠিয়েছিলো। সেখানকার মুজাহিদ শিবিরগুলোতে তারা যে ধরনের উন্নত ইসলামী শিক্ষা লাভ করেছিল সে ধরনের শিক্ষা অনেক আরব রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক বলে নিষিদ্ধ।

আশির দশকের মাঝামাঝি আফগানিস্তান সারা বিশ্বের ইসলামী জিহাদীদের চুম্বুকের মতো আকর্ষণ করতে থাকে। মিসরীয় ও অন্যান্য আরব ইসালামী গ্রুপ অবশ্য তার আগে থেকে পেশোয়ারকে তাদের প্রবাসী সদর দফতর হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এখন ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার ফলে তারা একটা আন্তর্জাতিক জিহাদ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বদেশে তৎপরতা চালানোর পশ্চাৎবর্তী ঘাঁটি হিসাবে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে ব্যবহার করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আফগানিস্তানে প্রথম জিহাদ আন্দোলন ব্যুরো খুলেছিলেন ডা. আইমান আল-জাওয়াহিরি। ১৯৮৪ সালে মিসরের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লে. কর্নেল আবুদ আল-জুমুরের গুপ্ত সংগঠন ইসলামী জিহাদ আন্দোলনের জন্য এই ব্যুরো খোলা হয়। জুমুর এ জিহাদ আন্দোলনের সামরিক কমান্ডার ছিলেন। সাদাত হত্যাকা-ের প্রক্কালে তিনি ধরা পড়েন।আশির দশকের মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক মুজাহিদদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান শুরু করলে জাওয়াহিরি মিসর থেকে পালিয়ে যান। জাওয়াহিরি বর্তমানে বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী এবং তাঁর সংগঠনের একজন সিনিয়র সামরিক কমান্ডার। আফগানিস্তানে বিদেশী সেচ্ছসেবকদের প্রথম জেনারেশনের সদস্যদের নিয়েই আজ সেখনকার ইসলামী জিহাদী আন্দোলনের হাই কমান্ড গঠিত। এই সদস্যদের সবাই বিন লদেনের দারুণ অনুগত।

*বিন লাদেনের আফগান মিশন শেষ।*

আশির দশকের মাঝামাঝি আফগানদের সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তার আগেই ওসামা বিন লাদেন একজন সাহসী ও কুশলী কমান্ডার হিসাবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৮৬ সালে তিনি আরব মুজাহিদ ইউনিটের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে

জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ নেন। ১৯৮৭ সালে তিনি পাকতিয়া প্রদেশের শাবানে সোভিয়েত-আফগান যৌথ অবস্থানের ওপর আঘাত হানেন। তাঁর নেতৃত্বে আরব ও আফগান মুজাহিদদের সম্মিলিত বাহিনী শত্রুব্যূহ ভেদ করে। প্রচ- হাতাহাতি যুদ্ধের পর মুজাহিদ বাহিনী শেষ পর্যন্ত হটে যেতে বাধ্য হয়। বিন লাদেনের হাতে আজও যে কালাসনিকভ রাইফেলটি দেখা যায়, সেটা তিনি এই যুদ্ধে এক রুশ জেনারেলের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। পাকতিয়া যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও বিন লাদেনের মনোবল এতটুকু ক্ষুণ হয়নি। বরং তিনি আরও দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। আরব ও আফগান মুজাহিদদের কাছে তিনি হয়ে দাঁড়ান এক ব্যতিক্রম চরিত্রের বীর, যিনি সৌদি আরবের প্রাসাদ জীবন ছেড়ে চলে এসেছেন বন্ধুর আফগানিস্তানে। আফগান জীবনে একীভূত হয়ে গেছেন। তাদের একজন হয়ে লড়েছেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বিন লাদেন তার ভাবপুরুষ শেখ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আয্যমের সঙ্গে আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারকাজে গেছেন। প্রচারকাজ চালাতে গিয়ে শেখ আয্যাম আফগান মুজাহিদদের উদ্দেশে যা বলেছেন সেগুলোই আজ বিন লাদেনের বিশ্বব্যাপী জিহাদের ডাকের মর্মবাণী হিসাবে কাজ করছে। তার জিহাদের লক্ষ্য একটা একীভূত প্যান ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা, যা শেষ পর্যন্ত গোটা মুসলিম বিশ্ব শাসন করবে। আর যতক্ষণ সেই খিলাফত বা আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর এই জিহাদ চালিয়ে যেতে তিনি বদ্ধপরিকর।

আশির দশকের গোটা অধ্যায় জুড়ে ওসামা বিন লাদেন সৌদি আরবের শসকগোষ্ঠী বিশেষ করে সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে ছিলেন। ঐ সংস্থার প্রধান শাহজাদা তুর্কী আল-ফয়সালের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়। বাবার মতো ওসামা বিন লাদেনও বিভিন্ন কার্যক্রমে সৌদি আরবের বিভিন্ন মহলে অর্থ সাহায্য গোপনে পৌঁছে দেয়ার একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন। এসব কার্যক্রমের একটা ছিল আফগান মুজাহিদদের সাহায্য দান। আল সৌদ রাজপরিবার এবং আরব বিশ্বের অন্যান্য রক্ষণশীল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন যেসব ইসলামী সংগঠন আফগানিস্তানে তৎপর ছিল তাদের এই জাতীয় অর্থ সাহায্য পৌঁছে দেয়া রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। তথাপি এ কাজটা বিন লাদেনের হাত দিয়ে ঘটত। সুসম্পর্কের কারণেই বিন লাদেনকে এজন্য সৌদি রাজপরিবার বা অন্যদের বিরাগভাজন হতে হয়নি। শেখ আয্যাম ও বিন লাদেন মিলে পেশোয়ারে বাইতুল আনসার নামে যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছিলেন গোটা আশির দশক জুড়ে তা চালু ছিল।

এ সময় আফগান যুদ্ধে লড়বার জন্য যেসব আরব স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল তাদের ট্রেনিং দিয়ে বিভিন্ন জিহাদী সংগঠনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এ সব সংগঠন থেকে তারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে বাইতুল আনসার একেকটি দেশের স্বেচ্ছাসেবকদের একেকটি গ্রুপে সংগঠিত করে, যাতে করে তারা নিজ নিজ দেশে গিয়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ করে। যেমন তাজিক নেতা আহমাদ শাহ মাসুদের কমান্ডে থেকে লড়াই করেছিল প্রায় তিন হাজার আলজেরীয় স্বেচ্ছাসেবক। এদেরই একটা বড় অংশ নিয়ে পরবর্তীকালে গঠিত হয় 'আলজেরীয় লিজিয়ন'। ৯০ এর দশকের প্রথম দিকে এই আলজেরীয় লিজিয়নের সদস্যরা স্বদেশ আলজেরিয়ায় গিয়ে অতিমাত্রায় আক্রমানত্মক ও রক্তক্ষয়ী কর্মকা-ে অংশ নিয়েছিল। এখানে আরেকটি তথ্যও জেনে রাখা ভালো যে, আহমাদ শাহ মাসুদের সাথে আলজেরীয় জিহাদী কমান্ডার হাজ বুনুয়ার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

যাই হোক রুশবিরোধী আফগান যুদ্ধের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত ওসামা বিন লাদেন ও তার অনুসারীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এভাবে এক সময় এলো ১৯৮৯ সাল। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শেষ সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হলো আফগানিস্তান থেকে। কাবুলে থেকে গেল সোভিয়েত সামরিক সাহায্যপুষ্ট নজিবুল্লাহ সরকার। এই সরকারের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিল আফগান মুজাহিদ ও তাদের সাহায্যকারী বিশেষ জিহাদীরা। এখানে একটা কূট চাল চালাল পাকিস্তানের আইএসআই। রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের এক মাস পর ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে মুজাহিদ বাহিনী এক বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালাল জালালাবাদে। ঐ অভিযান আফগান সঙ্কটের নতুন অধ্যায়ের জন্ম দেয়। কাবুল সরকারের মূল সামরিক শক্তি ছিল জালালাবাদে। পাকিস্তান বোঝাল জালালাবাদ দখল করতে পারলে কাবুল সারকার পাকা ফলের মতো টুপ করে ঝরে পড়বে। মুজাহিদরা সে কথায় বিশ্বাস করল। চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য বিপুল সাহায্য দিল যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব। মুজাহিদদের মতো অতি নিয়মিত বাহিনীর এ ধরনের আক্রমণাভিযানের জন্য যেরূপ রণনীতি ও রণকৌশল নেয়া উচিত তা নিতে না দিয়ে আইএসআই তাদের জালালাবাদের সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা ঘাঁটিসমূহ ও বিশাল আর্টিলারি বাহিনীর ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানোর জন্য উসকে দিল। ইসলামাবাদ জানত সে ধরনের সম্মুখ আক্রমণে কচুকাটা হবে আক্রমণকারীরা। আইএসআই ঠিক এমনটাই চাইছিল। কারণ পাকিস্তানের কাছে ট্রেনিং ও অন্যান্য সাহায্য পেলেও মুজাহিদরা তখন ইসলামাবাদের অনেকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এরা কাবুলের ক্ষমতায় গিয়ে বসলে ব্যাপারটা পাকিস্তানের মোটেই সুখকর হতো না। সে জন্য তাদের শক্তিক্ষয় করতে চাইছিল পাকিস্তান। জালালাবাদে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ আক্রমণ চালাতে গিয়ে মুজাহিদ বাহিনী এমন কচুকাটা হয় যে তারা আর শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে টিকে থাকতে পারেনি।

ওসামা বিন লাদেন ও তার বহু অনুসারী জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এবং মুজাহিদ বাহিনীর ব্যাপক ও অর্থহীন নিধন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আয্যাম, বিন লাদেন ও অন্যান্য মুজাহিদ নেতারা পরে এই বিপর্যয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানেন যে, তারা আসলে মার্কিন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন এবং সেই ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের হাত দিয়ে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ঐ বছরের ২৪ নভেম্বর পেশোয়ারে শেখ আয্যামের গাড়িতে রাখা এক অত্যাধুনিক রিমোট কন্ট্রোল বোমা ফাটিয়ে দুই ছেলেসহ আয্যামকে হত্যা করা হয়। হত্যার দায়দায়িত্ব আজ পর্যন্ত কেউ স্বীকার করেনি। তবে এর পিছনে আইএসআই-এর হাত আছে বলে ধারণা করা হয়। এর অল্পদিন পরই বিন লাদেন তাঁর আফগানিস্তান মিশন শেষ হয়েছে মনে করে সৌদি আরব ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

### *বিন লাদেন ও আইএসআই*

বিন লাদেনের উত্থান ও তাঁর কর্মকান্ডের পিছনে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এরও সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে সোভিয়েতবিরোধী আফগান যুদ্ধে বিন লাদেন যে ভূমিকা পালন করেছিলেন আইএসআইয়ের সহযোগিতা ছাড়া সে ধরনের ভূমিকা পালন সম্ভব ছিল না। আফগান যুদ্ধে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে বিন লাদেন প্রথমে এসে উপস্থিত হন পাকিস্তানের পেশোয়ারে। সেখানে বিভিন্ন আরব দেশ থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি সংগঠিত করেন এবং ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেন। পেশোয়ারের এসব প্রশিক্ষণ ঘাঁটির সবই ছিল আইএসআইয়ের নজরদারির মধ্যে। তারা এসব প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে দরকার মতো উপকরণ দিয়ে সাহায্য করত। বিন লাদেনের ঘাঁটিও যে তা থেকে ব্যতিক্রম ছিল না এ কথা বলাই বাহুল্য। আফগান সঙ্কট সৃষ্টি হবার পর থেকেই পাকিস্তান এই সঙ্কটকে তার ভূ-রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক

স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এ ক্ষেত্রে তার হাতিয়ার হয়েছে আইএসআই। অচিরে আইএসআই আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদেরও বাহনে পরিণত হয়। ভারতের বিরুদ্ধে শিখ সন্ত্রাসবাদ ও নাশকতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল আইএসআই এর। সে অভিজ্ঞতা এবার তারা প্রয়োগ করল আফগানিস্তানে।

আফগান 'জিহাদকে জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য দেশগুলো ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক, সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিল পাকিস্তানকে আর সেই সাহায্য আফগানদের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হলো আইএসআই। আইএসআই এক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৭০ ভাগ বণ্টন করল আফগান ইসলামী দলগুলোকে। বিশেষ করে গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের হিজব-ই-ইসলামীকে। মার্কিন অর্থপুষ্ট প্রশিক্ষণ অবকাঠামোও প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল আইএসআই। তার ফলে আফগান মুজাহিদরা ছাড়াও পাকিস্তানের নিজস্ব স্বার্থে আরব জিহাদীদের থেকে শুরু করে আঞ্চলিক গ্রুপগুলোও প্রশিক্ষণ সুবিধা পেল। আশির দশকের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় ১৬ হাজার থেকে ২০ হাজার আরব মুজাহিদকে শুধু হিজব-ই-ইসলামীর সাথেই ট্রেনিং দেয়া হয়। তখন থেকে আইএসআই প্রতিমাসে গড়ে এক শ' আরব মুজাহিদকে ট্রেনিং দিতে থাকে। এরা পেশোয়ারে সামরিক শিক্ষা লাভ করে আফগানিস্তানে যায়। এবং আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসে সুদান ও ইয়েমেনে উচ্চতর পর্যায়ে ট্রেনিং নেয়। আরব ছাড়াও ভারতীয় কাশ্মীরের হাজার হাজার ইসলামী যোদ্ধা এবং কিছু সংখ্যক জঙ্গী শিখকেও ট্রেনিং দেয়া হয়।

১৯৮৬ সালে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) ও তার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ র‍্যাডিকেল তরুণদেরকে পাকিস্তানে আফগান মুজাহিদ শিবিরগুলোতে উচ্চতর ট্রেনিং গ্রহণের জন্য পাঠাতে শুরু করে। পরে এদের দেখাদেখি মিসরের 'আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ' এবং সিরিয়া ও লেবাননের মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো সংগঠনের সদস্যরাও পাকিস্তানের ওসব শিবিরে ট্রেনিং নিতে যায়। জেনে রাখা ভালো যে, আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ'র সদস্যরাও সাদাত হত্যায় অংশ নিয়েছিল। ইয়াসির আরাফাতের তৎকালীন সামরিক প্রধান খলিল আল ওয়াজির ওরফে আবু জিহাদ জর্দানের 'মুসলিম ব্রাদারহুড' ও তার সদস্যদেরকে আফগানিস্তানের লড়াইয়ে অংশ নিতে উৎসাহিত করে। তবে মজার ব্যাপার হলো, আইএসআই আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে আরব মুজাহিদদের বিশেষ করে মিসরীয়, জর্দানী ও ফিলিস্তিনীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও তাদের সবাইকে যে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে লড়াইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল তা নয়। প্রশিক্ষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেকে 'উধাও' হয়ে যেত। পরবর্তীকালে এদের নিয়েই গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদের এলিট বাহিনী। এসব বিদেশী স্বেচ্ছাসেবককে কাঁধ থেকে নিক্ষেপযোগ্য স্যাম ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার, অত্যাধুনিক রিমোট কন্ট্রোল ব্যবস্থায় বোমা বিস্ফোরণ, উন্নত ধরনের প্লাস্টিক বিস্ফোরক ব্যবহারসহ বিভিন্ন অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর পাশাপাশি দেয়া হয় ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারায় ব্যাপক দীক্ষাদান, যার ফলে তারা একেকজন গোঁড়া ও জানবাজ লড়াকুতে পরিণত হয়। এইভাবে আফাগানিস্তান ও পাকিস্তান প্রশিক্ষণ লাভ ও জিহাদে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইসলামী জিহাদের এক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। গোটা আশির দশক জুড়ে মূলত আফগান যুদ্ধের কারণে অস্ত্রশস্ত্রের ঢালাও সরবারাহের ফলে করাচী আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এই জিহাদের সাথে শুধু ফিলিস্তিনীরাই নয়, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, আফগানিস্তান, বার্মা, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্স এবং আফ্রিকার অনেক দেশের নাগরিকও যুক্ত হয়ে পড়ে বলে ডা. ইয়াসিন রিজভী নামে এক শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানী সাংবাদিক উল্লেখ করেন। এরা বিভিন্ন দেশে অন্তর্ঘাত ও জিহাদী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল যোগায়। আইএসআইয়ের প্রশিক্ষণ কাঠামোয় যৌথ প্রশিক্ষণ লাভ এবং অনেক ক্ষেত্রে আফগানিস্তানে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের ইসলামী জিহাদীদের ও তাদের সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে ওঠে। তাই দেখা যায় যে আশির দশকের শেষদিকে পাকিস্তানী পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত দুই কাশ্মীরী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদীন এবং ইখওয়ান আল মুসলিমীন তাদের ভারতবিরোধী লড়াইয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জিহাদী সংগঠনের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছে। তেমনি সাহায্য পেয়েছে বসনিয়ার মুসলমানরা। কসোভোর আলবেনীয়রা এবং ফিলিপিন্স ও মালয়শিয়ার জিহাদীরা। বিন লাদেনের আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদের পিছনে আইএসআই কতটা সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেটা অন্যত্র আলোচনায় বিশদভাবে দেখা যাবে।

### *সৌদি আরবে বিন লাদেন, নয়া সঙ্কট*

আফগান মিশন শেষ করে ১৯৮৯ সালে সৌদি আরবে ফিরে গেলেন ওসামা বিন লাদেন। ততদিনে তিনি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছেন আরও বেশি র‌্যাডিকেল। স্বদেশে অনেকে তাঁকে বীরের মর্যাদা দিল। অনেকে তাকে নেতা মানল। প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে তিনি একজন ‘সেলিব্রিটি’ হয়ে গেলেন। অসংখ্য মসজিদে ও ঘরোয়া সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন। এসব বক্তৃতায় জ্বালা ছিল, আগুন ছিল। অনেক বক্তৃতা রেকর্ড হলো। এগুলোর আড়াই লাখ ক্যাসেট প্রকাশ্যে বিক্রি হলো। অনেক বক্তৃতায় এমন বিষয় ছিল যে সেগুলোর ক্যাসেট বিক্রি হতে লাগল গোপনে। সৌদি রাজপরিবার তখনও বিন লাদেনের র‌্যাডিক্যাল চিন্তাধারাকে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী বা বিপজ্জনক ভাবেনি।

তাই বিন লাদেন তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াননি। এইভাবে কিছুদিন চলার পর ওসামা বিন লাদেন গুছিয়ে বসার চেষ্টা করলেন। পরিবারের যে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর জেদ্দা শাখার কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন। নিজের পরিবার নিয়ে উঠলেন সাদাসিধা এক এ্যাপার্টমেন্টে। নিজের প্রচারিত ইসলামী জীবনধারা বাস্তবে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। এইভাবে ১৯৮৯ সাল পেরিয়ে ১৯৯০ সালের অর্ধেকটা সময় চলে গেল। তারপর এলো ১৯৯০ এর ২ আগস্ট। ইরাক কুয়েতে হামলা চালিয়ে দখল করে নিল। সৌদি আরবে দেখা দিল আতঙ্ক। কুয়েতের আমির ও তাঁর পরিবারের নেতৃত্বে কুয়েতী উদ্বাস্তুর ঢল নামল সে দেশে।

সাদ্দাম হোসেন সৌদি আরবও আক্রমণ করতে পারেন এমন হিস্টিরিয়া পেয়ে বসল রিয়াদকে। এই নতুন সঙ্কটের মুখে ওসামা বিন লাদেন জেদ্দা থেকে তক্ষুণি রিয়াদে চলে গেলেন। তার দিক থেকে সাহায্যের প্রস্তাব দিলেন সরকারকে। সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাহজাদা সুলতানের সঙ্গে দেখা করলেন। সৌদি আরবের আত্মরক্ষার জন্য ১০ পৃষ্ঠার এক পরিকল্পনা পেশ করলেন তাঁর কাছে। তা ছাড়া বললেন যে, তাঁর পারিবারিক কোম্পানির মতো বিশাল নির্মাণ কোম্পানির হাতে যেসব ভারি প্রকৌশল সরঞ্জাম আছে, সেগুলো দিয়ে সৌদি আরবকে রক্ষার জন্য অতিদ্রুত বেশিকিছু সুরক্ষিত ব্যূহ গড়ে তোলা যাবে। তাছাড়া আফগান যুদ্ধে লড়াইয়ে পোড়খাওয়া যে বিপুলসংখ্যক সৌদি মুজাহিদ আছে তাদের রিক্রুট করে সৌদি বাহিনীর

শক্তিবৃদ্ধি করা যেতে পারে। দরকার হলে এই লোক সংগ্রহের কাজটা তিনিও করতে পারেন বলে জানালেন। সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান শাহজাদা তুর্কির কাছেও একই প্রস্তাব দিলেন তিনি। তার সঙ্গে বাড়তি একটা কথা বললেন এই যে, আফগান যুদ্ধাভিজ্ঞ এই সৌদিদের কুয়েতে জেহাদ পরিচালনার মূল শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উপসাগরের তেল ক্ষেত্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য আমেরিকার নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনী তখন সৌদি আরবের ওপর ভর করে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে ব্যাপারে বিশেষ সজাগ থেকে বিন লাদেন সৌদি নেতাদের বার বার হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, এসব 'বিধর্মী' বাহিনীকে যেন সৌদি আরবের পবিত্র ভূমিতে আমন্ত্রণ না জানানো হয় কিংবা আসতে না দেয়া হয়। কেননা, তা হলে বেশির ভাগ সৌদির এবং সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি মারাত্মক আহত হবে। এই উদ্বেগ প্রকাশ করার সময়ও ওসামা বিন লাদেন সৌদি রাজপরিবারের প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে দেখলেন যে তার কথা কেই গ্রাহ্য করল না। সাদ্দাম বাহিনীর ভয়ে আতঙ্কিত বাদশাহ ফাহাদ ও তার কোটারি ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর জন্য দরজা খুলে দিলেন। এই বাহিনী উপসাগর যুদ্ধে ইরাককে হারানোর পরও তখন থেকে মার্কিন সৈন্য রয়ে গেল সৌদি আরবে। বিন লাদেন আগে থেকে জানতেন মুসলমানদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হবে তীব্র। বিশেষ করে ইসলামী জিহাদীরা পবিত্র ভূমিতে বিধর্মীদের উপস্থিতির দ্বারা ইসলামের অবমাননা সহ্য করবে না। এজন্য তারা দেখে নিতে পারে সৌদি নেতাদের ।

অবশ্য সৌদি এলিটশ্রেণীর মধ্যে একমাত্র ওসামা বিন লাদেনই যে মার্কিন বাহিনীর আগমনের বিরোধিতা করেছিলেন, তা নয়। আরও অনেকেই করেছিল। সেই ১৯৯০ এর আগস্ট মাসেই বাদশাহ ফাহাদ স্বদেশে মার্কিন বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে ওলামা সমাজের অনুমোদন চেয়েছিলেন। কিন্তু ওলামাদের সবাই ছিল এর ঘোরতর বিরুদ্ধে। বাদশাহর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরই কেবল গ্রান্ড মুফতী শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ অনিচ্ছার সঙ্গে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন অনুমোদন করেছিলেন। তবে শর্ত ছিল যে, ইরাকী হুমকির অকাট্য প্রমাণ দেখাতে হবে। ওদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডিক চেনি প্রয়োজনের এক মিনিট বেশি মার্কিন সৈন্য সৌদি আরবে থাকবে না বলে আশ্বাস দেয়ার পর বাদশাহ ফাহাদ মক্কায় এক বৈঠকে সাড়ে তিনশ' ওলামার কাছ থেকে এই ব্যবস্থার পক্ষে সম্মতি আদায় করে নেন। সম্মতিটা তারা অবশ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিয়েছিলেন। মার্কিন সৈন্য মোতায়েন প্রশ্নে রাজপরিবারের সঙ্গে ওলামাদের বিরোধের এই খবরটি সৌদি আরবের সকল মহলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে শুধু সৌদি আরবে নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের র‍্যাডিকেল ও জিহাদপন্থী মুসলমানদের মধ্যে মার্কিন বিরোধিতার প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়।

সৌদি নেতারা ওসামা বিন লাদেনের কথায় কর্ণপাত না করায় তার মনে নিদারুণ যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মার্কিনবিরোধী এই জোয়ার দেখে তার সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। নতুন বলে বলীয়ান হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু তখনও তিনি মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছিলেন এক দিকে তিনি কুয়েত হামলার জন্য ইরাকের নিন্দা করছিলেন এবং ইরাকী বাহিনীকে কুয়েত থেকে বিতাড়িত করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন, অন্যদিকে একই সঙ্গে তিনি মার্কিন নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনীর উপস্থিতিকে ইসলামের ঘোরতর অপবিত্রকরণ আখ্যা দিচ্ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি মার্কিন পণ্য বর্জনেরও ডাক দেন।

কিন্তু আল-সৌদ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে তিনি তখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি। সামান্যতম সমালোচনাও করেননি। সৌদি রাজপরিবারকে চ্যালেঞ্জ না করে বিন লাদেন তখন বিপুলসংখ্যক জিহাদপন্থী মুসলিমদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। আফগানিস্তানের শেখ তামিমীসহ বেশিরভাগ মুজাহিদ নেতা তখন সাদ্দাম হোসেনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই সমর্থনের পিছনে তাদের যুক্তি ছিল এই যে কুয়েতকে রক্ষা করার চাইতে ইসলামের ঘোর দুশমন যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবেলা করার গুরুত্ব অনেক বেশি। তদুপরি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ নিয়ে এবং আরবের পবিত্র ভূমিতে বিদেশী বাহিনী ডেকে এনে আল-সৌদ রাজপরিবার মুসলমানদের তীর্থস্থানসমূহের হেফাজতকারী হিসাবে তাদের এতদিনের বৈধ অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। আফগানিস্তানের দিনগুলো থেকে বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মীদের আনেকেই এই বক্তব্যের সোচ্চার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু বিন লাদেন ছিলেন সৌদি বাদশাহর অনুগত প্রজা। তখনও তার বিশ্বাস ছিল যে সৌদি রাজপরিবারের উপরমহল যাদের অনেকের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা আছে, মার্কিন ও বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে বাদশাহকে প্রভাবিত করতে পারবে। তখনও পর্যন্ত তার আশা ছিল যে, রিয়াদ আমেরিকার বিপুল চাপ কাটিয়ে উঠতে পারবে। তাই বিদেশী সৈন্য আসতে দেয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেও বিন লাদেন তার অনুগত্য রেখেছিলেন বাদশাহর প্রতি।

### *সৌদি রাজশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সুদানের পথে বিন লাদেন*

সৌদি আরবে মার্কিন বাহিনী মোতায়েন প্রশ্নে কোন মহলের সমালোচনা বারদাশত করতে প্রস্তুত ছিল না সৌদি সরকার। তাই এ প্রশ্নে প্রথম দিকে বিন লাদেনের সমালোচনা আর অন্যান্য র‍্যাডিক্যাল ইসলামীদের সমালোচনার মধ্যেও যে একটা অবস্থানগত পার্থক্য ছিল, সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার কোন প্রয়োজনই সরকারের মনে হয়নি। সৌদি আরবে বিন লাদেনের জনপ্রিয়তা তখন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। এই জনপ্রিয়তা এক পর্যায়ে সৌদি সরকারের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার ওপর বিন লাদেন এখন সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করায় তাকে আল-সৌদ রাজপরিবারের শাসনের প্রতি হুমকি হিসাবে গণ্য করা হতে লাগল। সমালোচনা বন্ধ করতে ওসামা বিন লাদেনের ওপর নানাভাবে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করল সৌদি সরকার। প্রথম প্রথম এই বলে হুশিয়ার করে দেয়া হলো যে, তাকে যেসব লোভনীয় কনট্র্যাক্ট দেয়া হয়েছে, সমালোচনা বন্ধ না করলে সেগুলো বাতিল করা হবে।

যখন দেখা গেল ওতে কোন কাজ হচ্ছে না তখন নতুন হুমকি এল, তার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হবে। তাতেও যখন কাজ হলো না তখন বাবা, ভাই, শ্বশুরকুল ও অন্য আত্মীয়স্বজনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হলো লাদেনের মুখ বন্ধ করার জন্য। সৌদি কর্মকর্তারা হুমকি দিলেন, কথা না শুনলে রাজপরিবারের সাথে লাদেন পরিবারের যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তা ছিন্ন হয়ে যাবে এবং গোটা পরিবারের ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে পড়বে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, একই সময় সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক, তিনি যেন সৌদি রাজতন্ত্রবিরোধী অন্তর্ঘাতী শক্তির সাথে যোগ না দেন তা নিশ্চিত করা এবং দুই. আফগান যুদ্ধে অভিজ্ঞ সৌদি স্বেচ্ছাসেবকদের যে বিশাল নেটওয়ার্ক সৌদি আরবে আছে, তারা যেন সরকারবিরোধী ভূমিকা না নেয় সে চেষ্টা করা। রিয়াদ ভালোমতোই জানত বিন লাদেন সৌদি রাজতন্ত্রবিরোধী ইসলামী জিহাদ আন্দোলনে যোগ দিলে তার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণেই সে আন্দোলন তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সকল স্তরে প্রচন্ড বেগবান হয়ে উঠবে।

যাই হোক, উপসাগর যুদ্ধে একদিন শেষ হলো। স্বদেশের ওলামাদের দেয়া শর্তের কথা ভুলে গিয়ে সৌদি সরকার বিদেশী সৈন্য স্থায়ীভাবে মোতায়েনের সুযোগ দিলেন। ওসামা বিন লাদেন এবার আর সৌদি বাদাশাহর অনুগত প্রজা হিসাবে থাকতে পারলেন না। তিনি আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, রিয়াদকে দুটো পথের যে কোন একটা বেছে নিতে হবে, হয় স্বল্পমেয়াদী নিরাপত্তা নয়ত ইসলামের পবিত্র ভূমির হেফাজতকারী হিসাবে ন্যায়সঙ্গত বৈধতা। দেখে গেল, রিয়াদ প্রথমটিকেই বেছে নিয়েছে। কাজেই এবার সৌদি সরকারের সরাসরি বিরোধিতা করা ছাড়া আর কোন পথ রইল না বিন লাদেনের সামনে। রিয়াদও বুঝল যে, বিল লাদেনসহ ইসলামী জিহাদীরা এবার একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এদের সাথে সমঝোতার আর উপায় নেই। বিন লাদেন আর সৌদি সরকারের মধ্যে এখন সরাসরি বৈরিতা দেখা দিল। সে বৈরিতা এত বৃদ্ধি পেল যে, বিন লাদেন নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগলেন। নিজের জন্য বটেই, এমনকি তাদের বৃহত্তর পরিবারটি জন্যও, যে পরিবারে আছেন তার ভাই ও অন্যরা।

নিরাপত্তাহীনতার কারণে ওসামা বিন লাদেন তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে পাড়ি জমালেন ইসলামী জিহাদের নতুন স্বর্গ হাসান আল তুরাবির সুদানে। বিন লাদেন যখন সুদানে পৌঁছলেন তার আগেই সে দেশটির আধ্যাত্মিক নেতার আসন অলঙ্কৃত করে বসেছেন হাসান আব্দুল্লাহ আল তুরাবি। ১৯৮৯ সালের ৩০ জুনের সমারিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল ওমর আল বাশির ক্ষমতায় আসার পর তুরাবি ঐ অবস্থানে পৌঁছেন। গোঁড়া মুসলমান বশির সুদানে ইসলামী শাসন কায়েমের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও গণঅসন্তোষের কারণে পারেননি। বশিরের সমর্থপুষ্ট হয়ে তুরাবি এবার সুদান সরকারের প্রধান আদর্শগত তাত্ত্বিক ও পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়ালেন। আধুনিক যুগের অন্যতম খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ হাসান আব্দুল্লাহ আল তুরাবি সম্পর্কে এখানে দু'টি কথা না বললেই নয়। কারণ বিন লাদেনের বিশ্ব জিহাদ আন্দোলনের সাথে তুরাবির নিবিড় যোগসূত্র আছে।তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে। তা হলো ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বিন লাদেন সুদানে ছিলেন এবং এ সময়টা ছিল তার গঠনমূলক অধ্যায়। কাজেই ইসলামী জিহাদের স্বরূপ বুঝতে গেলে তুরাবি সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা দরকার। ১৯৩২ সালে দক্ষিণ সুদানের কাসালায় অত্যন্ত ধার্মিক পরিবারে তুরাবির জন্ম। বাবা ব্যবসায়ী হলেও ইসলামের একজন বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি আধুনিকপন্থীও ছিলেন। সুদান ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকার সময় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তুরাবি পরিবারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বাবার ভূমিকা তুরাবির শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তিনি সুদানের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছেন আর ইসলামের ওপর শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভ করেছেন বাবার কাছে। চিরায়ত আরবী সংস্কৃতি ও কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তার সম্যক পরিচয় ঘটে। ১৯৫৫ সালে তুরাবি খার্তুমের ব্রিটিশ পরিচালিত গার্ডেন কলেজ থেকে আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তবে তার ঢের আগে সেই ১৯৫১ সাল থেকে তিনি ছিলেন মিসরীয় মুসলিম ব্রাদারহুডের খার্তুম শাখার গোপন সদস্য। অচিরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক লিবারেশন মুভমেন্টের প্রধান হয়ে দাড়ান। ওটা ছিল ব্রাদারহুডেরই অঙ্গ সংগঠন।

তুরাবির মন ইসলামের প্রতি নিবিষ্ট হলেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে কখনও উপেক্ষ্য করেননি। এদিক থেকে তিনি সহকর্মীদের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ নিয়ে আইনশাস্ত্র পড়তে যান। ১৯৫৭ সালে সেখানে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ১৯৬৪ সালে সরবোন থেকে আইনে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

তুরাবি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা অনর্গল বলতে পারেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার ভাল পরিচয় আছে। যুক্তরাষ্টসহ ইউরোপের প্রচুর দেশ সফর করেছেন এবং এখনও করছেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তুরাবি বিভিন্ন ইসলামী গ্রুপ ও ব্যক্তির কোয়ালিশন ইসলামিক চার্টার ফ্রন্ট গঠন করে তার ইসলামী রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করতে থাকেন।

ইসলামী বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি রাজনৈতিক ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদ ও আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর একজন শীর্ষস্থানীয় প-িত বা বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়ান। তাই সুদানে ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল বশির যখন তুরাবিকে ইসলামী সামরিক একনায়কতন্ত্র পরিচালনায় সাহায্য করার আহ্বান জানালেন তখন তাতে সাড়া দিতে ভুলেননি তুরাবি। সুদানকে সুন্নী ইসলামের পুনরুজ্জীবনের কেন্দ্রে পরিণত করার এমন সুযোগ তিনি হারাতে চাননি। ওসামা বিন লাদেন ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সুদানে ছিলেন। এ সময়টা সুন্নী ইসলামী আন্দোলনের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি বিন লাদেনের জন্যও ছিল বিশ্ব ইসলামী জিহাদের অন্যতম স্থপতি হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার পর্যায়। ইতোপূর্বে উপসাগর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইসলামী জিহাদীরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে যে, সৌদি আরব ও কুয়েতের শাসকদের মতো দুর্নীতিবাজ শাসকরা টিকে থাকতে পারছে-শুধু এই কারণে যে পশ্চিমী দেশগুলো তাদের এই ক্রীড়ানকদের সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করতে ওয়াদাবদ্ধ থাকছে। এমনকি এজন্য ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ করতে বা যুদ্ধে যেতেও তাদের দ্বিধা নেই। এ অবস্থায় দেশে দেশে ইসলামী সমাজ ও শাসন কায়েম করতে হলে পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আগাত হানা ছাড়া উপায় নেই বলে মনে করে ইসলামী জিহাদীরা। এই ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিলেন তুরাবি। ১৯৯১ সালের হেমন্ত থেকে শুরু করে পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামী জিহাদ, আন্দোল ও সংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটে। বিভিন্ন জিহাদী সংগঠন এ সময় সুন্নী জিহাদী নেটওয়ার্কে একীভূত হয়ে গঠন করে নয়া ইসলামিস্ট ইন্টারন্যাশন্যাল, যা ছিল ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম ব্রাদারহুডের ধর্মীয় কাঠামোর আওতায় কর্মরত বিভিন্ন জিহাদী সংস্থার ছত্রছায়া সংগঠন।

নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে ইসলামিক ইন্টরন্যাশনালের জিহাদী অঙ্গ সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে আর্মড ইসলামিক মুভমেন্ট। সুদানে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত অবস্থানকালে ওসামা বিন লাদেন এই নতুন ইসলামিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, বিশেষ করে এর অঙ্গ সংগঠন আর্মড ইসলামিক মুভমেন্ট এর আবির্ভাবের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রেখেছিলেন। সে সময় তিনি আজকের মতো আদর্শগত ও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রাণপুরুষ না হলেও তখনকার ঘটনাপ্রবাহের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন- এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।আর্মড ইসলামিক মুভমেন্ট সাধারণ মানুষের কাছে ‘ইন্টারন্যাশনাল লিজিয়ন অব ইসলাম’ নামেই বেশি পরিচিত ছিল। আজ আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসলামী জিহাদের যে উত্তাল জোয়ার বইছে, তার অগ্রসারিতে আছে ‘আর্মড ইসলামিক মুভমেন্ট’। এর শীর্ষ পর্যায়ের জিহাদীরা সাধারণভাবে আফগান বলে পরিচিত। এমনটা হওয়ার কারণও আছে। এর অধিকাংশই পাকিস্তানে আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে একত্রে ট্রেনিং নিয়েছিল এবং অনেকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। নব্বইয়ের দশকের প্রথম ভাগ থেকে ‘ইসলামিস্ট লিজিয়ন’ ইসলামী মুক্তিসংগ্রাম সংগঠিত ও প্রসারিত করার জন্য তার জিহাদী সদস্যদের গোটা এশিয়া, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র ছড়িয়ে দেয়।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সুদানে অবস্থানকালে বিন লাদেন আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদের একজন সংগঠক হিসাবে ইসলামিক এ্যারাব পিপলস কনফারেন্স, পপুলার ইন্টরন্যাশনাল আর্গানাইজেশন, ইসলামিক মুসলিম ব্রাদারহুড প্রভৃতি সংগঠন

ও ফোরামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সমপৃক্ত হয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে হাসান তুরাবির ঘনিষ্ঠ সানিধ্যেও আসেন। ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত গতিপ্রকৃতি নিয়ে তাদের মধ্যে চিন্তার আদান প্রদান হয়। তুরাবি লাদেনের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে প্রভূত অবদান রেখেছিলেন। অচিরেই বিন লাদেন তুরাবির ইনার সার্কেলের একজন সদস্য হয়ে দাঁড়ান।

### *গোপন লেনদেনে বিন লাদেন*

বৈরী পরিস্থিতির কারণে সৌদি আরবে টিকতে না পেরে ১৯৯১ সালে সুদানে চলে গেয়েছিলেন ওসামা বিন লাদেন। ভেবেছিলেন সেখানে নতুন করে ব্যবসায়ে ক্যারিয়ার গড়ে তুলবেন। পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে স্থির হয়ে বসবেন। শেষের উদ্দেশ্যটি অবশ্য পূরণ হয়নি। তবে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন ইসলামী জিহাদ আন্দোলন সংগঠনে। ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে গিয়ে বিন লাদেন আগে সুদান ও অন্যান্য দেশে বিশেষ করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও পূর্ব আফ্রিকায় কোথায় কী বিনিয়োগের সুযোগ আছে তা পরীক্ষা করে দেখেন।

আমদানি-রফতানি ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থান বেশ আকর্ষণীয় ও লাভজনক বিনিয়োগ। ওদিকেই বিন লাদেনের ঝোঁক ছিল বেশি। সেদিকেই তিনি ঝুঁকে পড়লেন এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেশ কিছু ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থলগ্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এই সুসম্পর্কের বদৌলতে পরবর্তীকালে তিনি হয়ে দাঁড়ান বিশ্বব্যাপী ইসলামী জিহাদীদের অর্থ প্রেরণ ও আর্থিক লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। কিভাবে সেটা ঘটল তার একটা পটভূমি আছে এবং এখানে সে সম্পর্ক দু'চার কথা না বললেই নয়। বিসিসিআই ব্যাংক কেলেঙ্কারির কথা কে না জানেন। ১৯৯১ সালের ৫ জুলাই ব্যাংকটি বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রধানত উপরসাগরীয় আরব দেশগুলোর ধনী শেখদের অর্থ সংস্থানে গঠিত ব্যাংকটি পাকিস্তানীদের দ্বারা পরিচালিত হতো।

বিসিসিআই কত রকম গোপন কর্মকান্ডে যে জড়িত ছিল তার ঠিক নেই। জিহাদী, মুসলিম গুপ্ত সংস্থা ও মুজাহিদদের অর্থ যোগাত। অস্ত্রশস্ত্র ও স্পর্শকাতর স্ট্র্যাটেজিক প্রযুক্তি কেনার ব্যাপারে গোপন আর্থিক লেনদেন করত। উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্নীতিবাজ নেতাদের মেরে দেয়া টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখা বা অন্যত্র পাচার করা এসব কাজ তো ছিলই। আশির দশকের বিসিসিআই ব্যাংক ছিল আফগান মুজাহিদদের সিআইএ'র দেয়া গোপন সাহায্য হস্তান্তরের প্রধান মাধ্যম। সৌদি আরব, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশও তাদের গোপন কার্যক্রমের জন্য বিসিসিআইয়ের বিচিত্র কৌশলকে কাজে লাগাত।

কাজে কাজেই আফগান মুজাহিদরা ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠনও যে বিসিসিআই-কে ব্যবহার করেছিল তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেসব গোপন কার্যক্রম চালাতে গিয়ে ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট কোন নথিপত্র রাখেনি। নিজেদের জড়িত থাকারও কোন প্রমাণ রাখেনি। আর্থিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যাংকটি ছিল অন্তঃসারশূন্য এবং সত্যিকারের আর্থিক সচ্ছলতা কখনই ছিল না। কাজেই ১৯৯১ সালের জুলাইয়ে ব্যাংকটি যখন বন্ধ করে দেয়া হলো, ক্লায়েন্টদের অনেকেই পথে বসল। জিহাদী ও অন্যান্য গুপ্ত সংস্থার গচ্ছিত বিপুল অঙ্কের অর্থ শুধু যে খোয়া গেল তাই নয়, তাদের লেনদেন পরিচালনার একান্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আর কোন প্রতিষ্ঠানও রইল না।

বিশ্বব্যাপী নতুন ইসলামী জিহাদ আন্দোলনের জোয়ার যখন সৃষ্টি হতে চলেছে তখন এসব কার্যক্রমে গোপনে ও নিরাপদে অর্থ সংস্থানের এমন একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমের অনুপস্থিতি আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের চিন্তায় ফেলল। এই সমস্যার সমাধান এনে পপুলার ইন্টারন্যাশনাল আর্গ্যানাইজেশন এবং আর্মড ইসলামিক মুভমেন্ট এর জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা পুনঃর্নির্মাণ করতে পারবে এমন একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা তীব্ররূপে অনুভূত হলো। আর্থিক ক্ষেত্রে এ ধরনের ভজঘট অবস্থা থেকে পরিত্রাণ এনে দেয়ার ব্যাপারে সে সময় খার্তুমে ওসামা বিন লাদেনের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। সেটা বুঝতে পেরেই স্বয়ং তুরাবি ১৯৯১ সালের গ্রীষ্মে সরাসরি এ ব্যাপারে বিন লাদেনের সাহায্য কামনা করলেন। ইসলামী জিহাদ তৎপরতায় সহায়তা দানের জন্য একটা নির্ভরযোগ্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুরুত্ব তুরাবি সর্বদাই অনুভব করেছিলেন। বশির যখন ক্ষমতা দখল করলেন ততদিনে সুদান গোটা অঞ্চলের, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার ইসলামী জিহাদ আন্দোলনে অর্থ সংস্থানের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

আশির দশকের শেষদিকে তুরাবির তত্ত্বাবধানে ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম ব্রাদারহুড পাশ্চাত্যে পরিচালিত কয়েকটি বড় ধরনের ইসলামী অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। যেমন- ইসলামিক হোল্ডিং কোম্পানি, জর্ডানিয়ন ইসলামিক ব্যাংক, দি দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, দি ফয়সাল ইসলামীক ব্যাংক প্রভৃতি। ১৯৯১ সালে আজিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাকওয়া ব্যাংক। ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম ব্রাদারহুড এই তাকওয়া ব্যাংককে জিহাদীদের বিশ্বব্যাংক হিসাবে গণ্য করতে থাকে। যার লক্ষ্য হচ্ছে পাশ্চাত্যের অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া। ইসলামী জিহাদী সংস্থা বা আন্দোলনগুলো একদিকে তাদের গোপন কার্যক্রমে আর্থিক লেনদেনের জন্য বহুলাংশে বিসিসিআইয়ের ওপর নির্ভর করে চলছিল এবং অন্যদিকে নতুন ইসলামী ব্যাংকগুলোকেও তাদের কর্মকান্ডের সঙ্গে ধাতস্থ করে তুলেছিল। ঠিক এমনি সময় হলো বিপর্যয়। বিসিসিআই মুখ থুবড়ে পড়ল। ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম ব্রাদারহুডের কাজকর্ম তখন অর্থাভাবে ব্যাহত হতে লাগল।

ইসলামী আন্দোলনগুলোতে আর্থিক সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে ইতোমধ্যে সুদান ও ইরানের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ইরান সেই অর্র্থ পাঠানোর আগেই তা গোপনে সঞ্চিত রাখার বা ট্রান্সফার করার মতো এ্যাকাউন্ট খুঁজে বের করার দরকার হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় বিন লাদেন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন। তিনি নিজের কোম্পানির ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকাউন্টকে ইসলামী তহবিলের ভেন্যু ও ফ্রন্ট হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ দিলেন। এভাবে ১৯৯১ সালের শেষদিকে তেহরানের পাঠানো ৩ কোটি ডলার জমাও হলো বিন লাদেনের কোম্পানির এ্যাকাউন্টে। বিশ্বজুড়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইরানের ব্যাংকগুলোর কাজকর্ম এবং তারা কোথায় কোথায় গোপনে অর্থ পাঠাচ্ছে তার ওপর তীক্ষ নজর রেখে চলছিল। বিন লাদেনের কোম্পানির এ্যাকাউন্টে অর্থ ট্রান্সফারের কাজটা প্রকাশ্যেই ঘটেছিল এবং তা থেকে কারও কিছুই সন্দেহ করার কারণ ঘটেনি। কেননা লাদেনের তখনকার বাহ্যিক পরিচয় একজন ধনকুবের ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু ছিল না।

### *বিন লাদেনের বিস্ময়কর নেটওয়ার্ক*

বিসিসিআই ব্যাংক বন্ধ হবার ফলে দেশে দেশে ইসলামী জিহাদী কার্যকলাপের পিছনে বিভিন্ন মহলের দেয়া অর্থ গোপনে প্রেরণের ক্ষেত্রে সাময়িক অচলাবস্থা দেখা দিলেও এভাবে বিন লাদেন তার একক বুদ্ধি ও চাতুর্যের দ্বারা তা দূর করতে সক্ষম

হন। বিন লাদেন এরপর ব্যবস্থাটিকে আরেকটু প্রসারিত করেন। ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম ব্রাদারহুড নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সুদানী ব্যাংকে বিন লাদেন তাঁর কোম্পানির নামে বেশ কিছু এ্যাকাউন্ট খোলেন। এই এ্যকাউন্টগুলোই গোপনে অর্থ প্রেরণ ও ট্রান্সফারের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবেই আলজিরিয়ায় নির্বাচনের প্রাক্কালে ধনী ইরানীদের এবং শেখ শাসিত উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর র‌্যাডিকল ইসলামপন্থীদের দেয়া ১ কোটি ২০ লাখ ডলার খার্তুমে ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক শাখায় গচ্ছিত রাখা হয়। সেখান থেকে তা পোপনে পাচার করা হয় আলজিরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টকে সাহায্য করার জন্য। বলাবাহুল্য, ঐ নির্বাচনে স্যালভেশন ফ্রন্ট কার্য ত বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৯২ সালের প্রথমদিকে সুদানে এভাবে আরও ২ কোটি ডলার ট্রান্সফার করা হয়। তার পর সেখান থেকে পাঠানো হয় আলজিরিয়ায়। এরও উদ্দেশ্য ছিল ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টকে সাহায্য করা। ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি ইরান জিহাদী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সুদানকে ৩ কোটি ডলার সাহায্য দেয়। এটা হার্ড কারেন্সিতে দেয়া হয়েছিল। অবশ্য এই অর্থের সিংহভাগ লন্ডনের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়, যা ছিল তুরাবির নিয়ন্ত্রণে। পরে ঐ অর্থ আন্তর্জাতিক জিহাদী তৎপরতায় ব্যয় হয়েছিল। সুদানে জিহাদী প্রশিক্ষণের যাবতীয় খরচ খার্তুম তার জাতীয় বাজেট থেকে মিটিয়েছিল।

বিন লাদেন জানতেন যে, গোপনে অর্থ প্রেরণ ও বিলিবণ্টনের যে ব্যবস্থা তিনি গড়ে তুলেছেন সেটা একটা সাময়িক জোড়াতালি ব্যবস্থা মাত্র। এর চেয়ে অনেক বেশি সুসংবদ্ধ ও স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা দরকার। তুরাবিও এই ধারণার সাথে একমত ছিলেন। ওদিকে আফগান নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আফগানিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য পাশ্চাত্যে চোরাচালান করার এবং এই ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা জিহাদী নেটওয়ার্ক বিস্তারে সাহায্যের জন্য যথাযথ সংস্থাকে পাঠানোর ব্যাপারে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যেও অর্থ লেনদেনের আরেক কৌশল উদ্ভাবন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিন লাদেন এ ব্যাপারে দ্বৈত কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রথমে তিনি মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাংকে বেশকিছু এ্যকাউন্ট খুললেন এবং ওগুলোতে নিজের টাকা ও তুরাবির ধনবান সমর্থকদের টাকা জমা রাখলেন। এই টাকা অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রধানত কোল্যাটারল বা জামানত হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তবে অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গত কিছু কিছু খরচও এসব এ্যাকাউন্ট থেকে মিটানো হয়েছিল। যেমন, ১৯৯৩ সালে সুদান ও অন্যান্য এলাকায় অবস্থানরত আফগান যুদ্ধাভিজ্ঞ সৈনিকদের খাদ্য ও ঔষধপত্র সংগ্রহের খরচ মিটানোর জন্য বিন লাদেন দুই মিলিয়ন ডলারের একটি চেক দিয়েছিলেন। চেকটি ছিল ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংকে বিন লাদেনের ব্যক্তিগত একটি এ্যাকাউন্টের। চেকটা তিনি নিজের হাতে তুরাবিকে দিয়েছিলেন বলে বিন লাদেন দাবি করেন।

কিন্তু ওটা ছিল ছোটখাটো অঙ্কের লেনদেন। বিশাল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন পরিচালনার জন্য আরও ব্যাপক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। সেই লক্ষ্যে বিন লাদেন এবং তুরাবির অনুগত কিছু সুদানী ধনী ব্যবসায়ী খার্তুমের শামাল (নর্থ) ইসলামিক ব্যাংকে মূলধন যুগিয়েছিলেন। বিন লাদেন দাবি করেছেন যে, ব্যাংকের মূলধন বাবদ তিনি দিয়েছিলেন ৫ কোটি ডলার। তবে সে অর্র্থটা তার নিজের ছিল, নাকি অন্য কারও ছিল জানা যায়নি। ইসলামী জিহাদের আর্থিক প্রয়োজন মিটাতে শামাল ব্যাংকের মাধ্যমে অনেক রকম লেনদেন করা হয়। এ ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে দেয়ার জন্য সুদান সরকার খুশি হয়ে বিন লাদেনকে পশ্চিম সুদানে ও করডোফানো এক মিলিয়ন বা ১০ লাখ একর জমির মালিকানা দিয়ে দেন। বিল লাদেনের পক্ষ থেকে আজও এ জমি চাষাবাদের কাজে এবং গবাদিপশু পালনে ব্যবহার করা হচ্ছে।বিন লাদেন উদ্ভাবিত এই ব্যাংকিং

ব্যবস্থায় কী পরিমাণ অর্থ জড়িত ছিল তার একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে, খুব সম্ভবত ১৯৯৩ বা ৯৪ সালে তুরাবি ইসলামিক এ্যাবার পিপলস কংগ্রেস এর আওতাভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী জিহাদ পরিচালনায় অর্থ সংস্থানের জন্য একটা বিশেষ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রায় ১০ কোটি ডলার এই তহবিল গঠনের জন্য দেয়া হয়। তহবিল দেখাশোনার জন্য তুরাবির সহকর্মী ইব্রাহিম আল-সানুসিকে চেয়ারম্যান করে একটি বিশেষ কমিটিও গঠিত হয়। এই তহবিল ছিল ধরনের অসংখ্য তহবিলের একটি।

কিন্তু এ ছিল সবে শুরু। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ বিন লাদেন তাঁর আফগান জীবনের সময়কার সহায্যদাতা ও পারিবারিক যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যার প্রকৃত স্বরূপ বের করতে পারা চরম শত্রুর দিক থেকেও ছিল অসম্ভব। প্রথমে বিন লাদেন তাঁর নব উদ্ভাবিত আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থাটিকে আইমান আল-জাওয়াহিরির জিহাদী নেটওয়ার্কের সাহায্যার্থে কাজে লাগান। বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও সহকর্মী জাওয়াহিরি সে সময় ইউরোপে অতিউন্নত ধরনের এক জিহাদী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছিলেন। জাওয়াহিরির জিহাদী নেটওয়ার্কে অর্থ সংস্থানের কাজটি সে সময় “ব্রাদারহুড গ্রুপ’ নামে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপটির মূল শক্তি হিসাবে ছিল এবং সম্ভাবত এখনও আছে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর ১৩৪ আরব ধনকুবের।

এঁদের মাধ্যমে অতিসুকৌশলে জিহাদীদের হাতে অর্থ পৌঁছে দেয়া হতো। উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়া যাতে তারা সাহায্যদাতা দেশেগুলোর সাথে জিহাদীদের কোন রকম যোগসূত্র বের করতে না পারে। ‘ব্রাদারহুড গ্রুপের’ প্রধান সদস্যরা পাশ্চাত্যে অর্থলগ্নির ক্ষেত্রে সুপরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রে এদের ৬৫ জনের বড় বড় কোম্পানি ও ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান আছে। নয়া ব্যবস্থায় এসব কোম্পানি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জিহাদীদের আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম, ছত্রছায়া ও ফ্রন্ট হিসাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কটি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপে নিযুক্ত জিহাদী বা তাদের নেতৃবৃন্দকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির লোকদেখানো চাকরি দিয়ে এবং ব্যবসায়িক ভিসার ব্যবস্থা করে ওসব দেশে তাদের বৈধ উপস্থিতির পথ সুগম করে দিয়েছে। এভাবে বিন লাদেনের উদ্ভাবিত গোটা আর্থিক ব্যবস্থাটি অতি দক্ষতার সাথে ও সুচারুরূপে চলছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো এই যে, গোটা পাশ্চাত্যের কোথাও জিহাদীদের উদ্দেশ্যে দেয়া অর্থ ধরা পড়েনি বা আটক হয়নি। বিন লাদেন আয়োজিত এই বিস্ময়কর নেটওয়ার্ক জেনেভা, লন্ডন, শিকাগোসহ বিশ্বের দেশে দেশে নীরবে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করে চলেছে।

### *চ্যারিটির ছত্রছায়ায় জিহাদী কর্মক্রম*

১৯৯৩ সালের মে মাস। একজন সিনিয়র জিহাদী কমান্ডারের কাছ থেকে উদ্ধার করা কিছু নথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে মিসরের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আশ্চর্য এক তথ্য পেলেন। বলা যেতে পারে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল। তারা জানতে পারলেন যে, মিসরীয় জিহাদীদের অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও প্রিন্টিং প্রেস কিনতে সাহায্য করার জন্য একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ আসছে এবং সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিন লাদেনের সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনটি, কিছুতেই

তার হদিস বের করা গেল না। মিসরীয় গোয়েন্দারা একটা বড় অঙ্কের অর্থের চালানের কথাও জানতে পারলেন, যা জিহাদী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। কিন্তু কিছুতেই ঐ অর্থের প্রবাহ রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তারা বুঝলেন, এ জাতীয় অর্থের চালান মিসরে প্রায়ই এসে থাকে। তবে কোন পথে সেটা প্রহেলিকাই থেকে গেল।

১৯৯৪ সালে মিসরীয় নিরাপত্তা সার্ভিস হিসাব করে দেখে যে, প্রতিবছর অজ্ঞাত সূত্র থেকে মিসরে এ জাতীয় অর্থ গড়ে ৫০ কোটি মিসরীয় পাউন্ড এসে থাকে। অস্ত্র ও বিস্ফোরক কেনা, জিহাদী অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের বেতনভাতা দান, কারারুদ্ধ বা আটক মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ প্রভৃতি কাজে ঐ অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। সে সময় একটানা অসংখ্য জিহাদী কর্মকান্ড ঘটছিল মিসরে এবং সেগুলোর সাথে অর্থের ঐ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের একটা নিবিড় যোগসূত্র ছিল বলে ধারণা করা হয়। বিদেশ থেকে আগত কিছু চেক আটক করা হলেও মিসরের নিরাপত্তা বিভাগ এসব অর্থের উৎসের যেমন হদিস বের করতে পারেনি, তেমনি পারেনি এর প্রবাহ বন্ধ করকে। এমন ব্যাপার শুধু যে মিসরের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল তা নয়, আরও বেশ কিছু দেশের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। অর্থ সরবরাহের এমনি অদৃশ্য ব্যবস্থা বিন লাদেনের উদ্ভাবিত বলে মনে করা হয়। বিন লাদেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা প্রায় বৈধ মর্যাদা পেয়েছিল। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে পরাজিত ইসলামী জিহাদীদের জন্য বিন লাদেন এ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। ব্যবস্থাটি প্রথমে আল-কায়দা ফাউন্ডেশন নামে একটি সাহায্য সংস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি বিন লাদেন ও তার ভাবপুরুষ শেখ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম মিলে ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রুশবিরেধী আফগান যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও প্রেরণ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

ঐ যুদ্ধ শেষ হবার পর ফাউন্ডেশনটি পুনর্গঠিত করা হয় এবং এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ পাঠানো হয় সারা বিশ্বে বিশেষ করে বসনিয়া, আলবেনিয়া ও কসোভোর মতো এলাকার ইসলামী কেন্দ্র ও মানবিক ত্রাণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায্যের জন্য, যেখানে মুজাহিদরা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার লড়াইয়ে নিয়োজিত। পরবর্তীকালে এই ফাউন্ডেশনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানবিক সাহায্য সংগঠন গড়ে ওঠে। ব্যহ্যিকভাবে মনে হতে পারে যে, এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই। ভিতরে ভিতরে নিবিড় যোগাযোগ আছে। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে অর্থ ও লোকবলও অহরহ দেয়া নেয়া হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষে এদের মধ্যকার সত্যিকারের যোগসূত্র বের করা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। এসব চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান ও মানবিক প্রকল্পগুলো ইসলামী জিহাদীদের ছত্রছায়া বা আশ্রয়ই শুধু দেয় না, তার চেয়ে ঢেড় বেশি কিছু দিয়ে থাকে। এরা ব্যাপক পরিসরে সামাজিক ও মানবিক সার্ভিসও দেয়। স্কুল, নার্সারি, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খামার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি তার অন্তর্গত। সামগ্রিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দুস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা যোগায়। তার ফলে এরা জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ও যথার্থ সমর্থন লাভ করে থাকে। ইসলামী জিহাদে এদের টেনে আনাও সহজতর হয়। ১৯৯৩ সালে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় প্রায় দু'ডজন চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান ও মানবিক প্রকল্পের ছত্রছায়ায় ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার ইসলামী জিহাদী কাজ করেছে বলে জানা গেছে। এগুলো বিন লাদেনের উদ্ভাবনী চিন্তার ফসল বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

১৯৯৬ সালে জনৈক মিসরীয় সাংবাদিককে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বিন লাদেন তার আর্থিক ও মানবিক তৎপরতার ক্ষেত্র ও পরিধির কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, তার সাহায্যের আওতায় আছে ১৩টি দেশ যথা

আলবেনিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ড, ব্রিটেন, রুমানিয়া, রাশিয়া, তুরস্ক, লেবানন, ইরাক এবং কিছু উপসাগরীয় দেশ। এক পর্যায়ে রহস্যময় হাসি দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, তার সাহায্য আসে বিশেষ করে হিউম্যান কনসার্ন ইন্টরন্যাশনাল সোসাইটি নামে একটি সংস্থা থেকে, যা ১৯৮২ সালে আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জন্ম আফগানিস্তানে হলেও দারিদ্রক্লিষ্ঠ আফগানিস্তান এক পয়সাও এর তহবিলে দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে সৌদি আরব ও শেখ শাসিত উপসাগরীয় দেশগুলোর বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যাক্তি ও সমর্থকদের দেয়া সাহায্য গোপনে ঐ সোসাইটির তহবিলে জমা করা হয় এবং পরে তা বিভিন্ন মানবিক সাহায্য সংস্থাকে ছড়িয়ে দেয়া হয় যেগুলো আসলে জিহাদীদের ছত্রছায়া হিসাবে কাজ করেছে। সোসাইটির প্রধান কার্যালয় রয়েছে স্টকহোমে এবং এর শাখা অফিস বিশ্বের সর্বত্র ছাড়িয়ে আছে। যেমন ব্রিটেনে আছে আল-মুসাদাই সোসাইটি। বার্লিনে আছে আল-নাজদা (ত্রাণ) সোসাইটি। ইতালিতে আছে ইসলামিক সাপোর্ট সোসাইটি, জাগ্রেবে আছে মুত্তয়াকাক সোসাইটি এবং পেশোয়ারে আছে বায়তুল-আনসার।

ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ায় সেই সত্তরের দশক থেকে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নবাদী সংগঠনের আন্দোলন চলছিল। ইথিওপিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১৯৯১ সালের মে মাসে একটি চুক্তি হয়। তদানুযায়ী প্রেসিডেন্ট হাইলে মেঙ্গিসটু মরিয়ম পদত্যাগ করেন এবং মেলেস জেনাবির নেতৃত্বে বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। সংগঠনগুলোর বেশির ভাগই ছিল মুসলিম প্রধান। এগুলোর এধ্যে ইরিত্রিয়া যুক্তফ্রন্ট ১৯৯৩ সালের মে মাসে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে।অন্যদিকে সোমালিয়ায় ১৯৯০ সাল থেকে বিদ্রোহী তৎপরতায় নিয়োজিত সংগঠনগুলোর সবাই ছিল প্ল্যানভিত্তিক। তার মধ্যে প্রধান প্রধান সংগঠন হলো ইউনাইটেড সোমালি কংগ্রেস (হাউয়ি ক্লান), সোমালি ন্যাশনাল মুভমেন্ট (ইসাক ক্লান), সোমালি প্যাট্রিয়টিক মুভমেন্ট, (ওগাদেনি ও কিসমায়ু ক্লান) এবং সোমালি ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (রাহানওয়েন ক্লান।) ১৯৯২ সালে সোমালিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের জন্য প্রাকৃতিক কারণ খরা যতটা না দায়ী ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি দায়ী ছিল মানুষের নিজের ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট সঙ্কট।

একদিকে উপজাতীয় যুদ্ধ এবং অন্যদিকে সোমালিয়ার প্রধান নেতাদের মধ্যকার ক্ষমতার লড়াই এই বিপর্যয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে সোমালিয়ায় ক্ষমতায় আসেন ইউনাইটেড সোমালি কংগ্রেসের অন্যতম নেতা আলী মাহদি মোহাম্মদ। কিন্তু ১৯৯১ সালের প্রথমদিকে ইউনাইটেড সোমালি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মাহদী মোহাম্মদের নেতৃত্বাধীন অংশ ও সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফারাহ আইদিদের নেতৃত্বাধীন অংশের মধ্যে বড় ধরনের ভাঙ্গণ ধরে। পরে তা ক্ষমতার তিক্ত লড়াইয়ের রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত ইউএসসি ভেঙ্গে যায়। ১৯৯২ সালে রাজধানী মোগাদিসুতে দুই পক্ষের ক্লান ও সাব ক্লানগুলোর মধ্যে যে ভয়াবহ লড়াই শুরু হয় তাতে রাজধানীর বেশিরভাগ নগরিক সুবিধা ও সেবা ব্যবস্থা ধসে পড়ে। ইতোমধ্যে সোমালিয়ায় দুর্ভিক্ষ ত্রাণে জাতিসংঘ ও পাশ্চাত্য দেশগুলো খাদ্য সাহায্য পাঠায়। সাহায্যের, বিশেষ করে খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য সরকারী বাহিনী ও আইদিদের অনুগত বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই বেঁধে যায়। সাহায্য লুট হয়ে যায়। এই পটভূমিতে যুক্তরাষ্ট্র মানবিক মিশনের নামে সোমালিয়ায় ১৯৯২ সালের নভেম্বরে এক বড় আকারের সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিলে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া হয়।

জেনারেল আইদিদ হুমকি দেন যে, যে কোন বৈদেশিক সৈন্য মোতায়েন করা হলে সোমালিয়ায় রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। একদিকে সাহায্য ও অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য আইদিদ বাহিনী অন্যান্য সংগঠন যথা এসএনএ, এসএলএ, এসপিএন, এসডিএম প্রভৃতির সঙ্গে জোট গড়ে তোলে এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পথগুলো দখল করে নেয়। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট আলী মাহদী মোহাম্মদ ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে আইদিদবিরোধি জোট গঠন করেন। গৃহযুদ্ধ যখন জোরেশোরে চলছে এ অবস্থায় সৌদি আরব ও পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত অসংখ্য দাতব্য বা সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে সোমালিয়ায় ইসলামী জিহাদীদের উপস্থিতি বেড়ে যায়। বৈদেশিক হস্তক্ষেপ অত্যাসন্ন হয়ে ওঠার মুখে তারা বিদেশী সাহায্যের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করে এবং বলে যে, এই সাহায্য নিয়ে আসার নামে পাশ্চাত্য আসলে সোমালিয়াকে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়ার পাঁয়তারা করেছে

। জিহাদীরা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এ্যাসোসিয়েশন, ওয়ার্ল্ড মুসলিম রিলিফ অর্গানাইজেশন প্রভৃতির ছত্রছায়ায় কাজ করে চলে। এগুলোর পিছনে বিশাল আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল বলে এগুলোকে কেউ ঘাটাতে সাহস পেত না। আসলে এগুলো ছিল জিহাদী নেটওয়ার্কের অংশ। এই নেটওয়ার্কের বেশকিছু ফ্রন্ট সংগঠন ওসামা বিন লাদেনের গড়া। মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে সোমালিয়ায় এক সুপ্রতিষ্ঠিত আর্থিক নেটওয়ার্কের অস্তিত্ব ছিল। বিভিন্ন জিহাদপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠন এতে অর্থ যোগাত। ১৯৯১ সালের শেষদিকে এই নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ লাভের মধ্য দিয়ে সোমালিয়ার ইসলামী আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা চূড়ান্তরূপে বিন লাদেনের হাতের মুঠোয় চলে আসে। ফলে তার পক্ষে সোমালিয়ায় মার্কিনবিরোধী অভিযানে অর্থ যোগাতে এবং সে অভিযান অব্যাহত রাখতে কোন বেগ পেতে হয়নি।

সোমলিয়ায় দুর্ভিক্ষ ও গৃহযুদ্ধ বিস্তৃত হবার পাশাপাশি সেখানে জিহাদী ইসলামীদের ঘাঁটি সুসংহত ও প্রসারিত করার জন্য ইরান-সুদানের যৌথ প্রয়াস অব্যাহত থাকে। তারই অংশ হিসাবে সুদানে ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, কেনিয়া ও উগান্ডার যোদ্ধাদের জন্য আরও অনেক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। বলা বাহুল্য, সেগুলো খোলার পিছনে ওসমা বিন লাদেনেরই ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। ১৯৯২ সালের শরতে তুরাবি গোটা পূর্ব আফ্রিকায় মার্কিনবিরোধী তৎপরতা জোরদার করার নির্দেশ দেয়ায় অল্পদিনের মধ্যে সুদান থেকে সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ায় জিহাদী নেতা ও বিশেষজ্ঞের অতিরিক্ত দল পাঠানো হয়।

সে বছরের ২২ নভেম্বর সোমালিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব জিহাদী মোতায়েনও বৃদ্ধি পায়। সোমালিয়ার এই জিহাদীদের বলে দেয়া হয়েছিল যে, জিহাদী তৎপরতা চালানো ছাড়াও তারা মিলিশিয়াদের ট্রেনিং ও নেতৃত্ব দেবে। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামও দেয়া হয়। এই মিলিশিয়াদের অনেকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ভিতরে থেকে কাজ করেছে। অন্যরা করেছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। বেশির ভাগ জিহাদী ইরিত্রিয়া হয়ে সোমালিয়া গেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিরা গোপনে সমুদ্র পথে এসে দক্ষিণ সোমালিয়া ও কেনিয়ায় নেমেছে। সোমালিয়ার এই জিহাদীরা সুদানের মাধ্যমে তেহরানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলো। আশির দশকের প্রথম দিকে বৈরুতে মার্কিন শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে সিরিয়া ও ইরান যেভাবে হিজবুল্লাহকে ব্যবহার করেছিল ঠিক একইভাবে সোমালিয়ার এই জিহাদীদের মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়েছিল ইরান।

*সোমালিয়া সঙ্কটে বিন লাদেন-২*

আমেরিকান মেরিন সোমালিয়ার সৈকতে এসে নামে ১৯৯২-এর ডিসেম্বরের প্রথমভাগে। প্রথম কিছুদিন তাদের শান্তিপূর্ণভাবেই কাটে-স্থানীয় বাহিনীর সঙ্গে বড় ধরনের কোন সংঘর্ষের সম্মূখীন হতে হয়নি। পরিস্থিতি তখন তুলনামূলকভাবে শান্ত থাকলেও সুদান ও ইরান লোহিত সাগর ও আফ্রিকা শৃঙ্গের ওপর যৌথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এজন্য ইসলামী জিহাদী শক্তিসমূহের প্রশিক্ষণ ও মোতায়েন সম্পন্ন করা হয়। সোমালিয়া এরা স্থানীয় শক্তিগুলোর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। যেমন- সোমালিল্যান্ডের নেতা আবদুর রহমান আহমদ আলী টুর যিনি তার এলাকায় শরয়ী আইন ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ছিলেন তুরাবির অতি ঘনিষ্টজন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি সুদান ও ইরানের সাহায্য পেয়েছিলেন। মধ্যসুদানে তুরাবি ও ওসামা বিন লাদেনের সবচেয়ে সক্রিয় ও অনুগত সমর্থক ছিলেন মোগদিসুর সাবেক পুলিশপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আবশির, যিনি সোমালী স্যালভেশন ডেমোক্র্যটিক ফ্রন্টের (ঝঝউচ) অন্যতম নেতা ছিলেন।

সুদান, মিসর, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের “সেচ্চাসেবকরা” ১৯৯২ সালে ঝঝউচ এর বাহিনীতে যোগ দেয়। তা ছাড়া জেনারেল আইদিদ ও সুদান সরকারের মধ্যে সামরিক সহযোগিতার অংশ হিসাবে আইদিদ আগে থেকেই সুদানের বৈষকি ও সামরিক সাহায্য পেয়ে আসছিলেন। ওদিকে ইথিওপিয়ায় ইরান ও সুদানের সাহায্যপুষ্ট ওরোমো লিবারেশন ফ্রন্ট রুপান্তরিত হয়ে গঠিত হয় ইসলামীক ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব ওরোমো। এই রূপান্তর সোমালিয়ার পরিস্থিতিরি ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। ১৯৯৩ সালে বিন লাদেন আয়োজিত ও সংগঠিত কিছু কিছু সরবরাহ পথ ওরোমো নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। জিবুতিতে তুরাবির সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন সে দেশের নিরাপত্তাপ্রধান ইসমাইল ওমর গুয়েলের চাচা। অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ জিবুতি দিয়ে সোমালিয়া পাঠানো হতো। প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে এসব নেটওয়ার্ক তৈরি করা ও পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো এবং সেই অর্থ গোপনে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ারও দরকার হতো। সে দায়িত্বটা অনিবার্যরূপে এসে পড়েছিল বিন লাদেনের ওপর। তিনি নিরাপদে সেই অর্থ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন।

শুধু তাই নয়, ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সুদান ও ইরান পূর্ব আফ্রিকায় তাদের তৎপরতার ব্যাপক বিস্তার ঘটালে প্রচলিত আর্থিক নেটওয়ার্ক দিয়ে সেই প্রয়োজন মিটানো যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় বিন লাদেন ও তাঁর দল ইউরোপ ও পূর্ব আফ্রিকাজুড়ে তাঁদের প্রচলিত ব্যাবসায় ও ব্যাংক এ্যাকাউন্টগুলো কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিন লাদেন ও তাঁর বন্ধুরা অর্থের গোপন প্রবাহ ত্বরান্বিত করার জন্য পূর্ব আফ্রিকায় বেশ কিছু ছদ্ম কোম্পানি ও ভূয়া এ্যাকাউন্ট খুলে বসেছিলেন।১৯৯২ সালের শরৎকালের মধ্যে সোমালিয়ায় ইসলামী সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি লক্ষণীয়ভাবে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হয়। তাদের তৎপরতার কেন্দ্র হয় মোগাদিসু, মারকা ও বোসাসো। তুরাবির সৃষ্ট সোমালি ইসলামিক ইউনিয়ন পার্টি (ঝওটচ) উত্তরে বোসাসোয় এবং দক্ষিণে মারকা ও জামামিতে তাদের প্রবল উপস্থিতির স্বাক্ষর রাখে।

ইথিওপিয়া সীমান্তের কাছে সোমালিল্যান্ড ওগাদেনে মুজাহিদদের জন্য আরও কিছু প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। এ ক্ষেত্রেও বিন লাদেন গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুদান সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু বেস ক্যাম্প ও গুদাম

ইথিওপিয়ার মাটিতে স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলে বিন লাদেন সেখানে বৈধ আন্তর্জাতিক কোম্পানী খোলেন। এই কোম্পানিগুলো তখন ঐ এলাকায় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে। এসব প্রকল্পের ছত্রছায়ায় ইথিওপিয়ায় অর্থ প্রেরণ করা হতে থাকে। এই অবকাঠামো সোমালিয়ায় মুজাহিদদের জোয়ার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়।

১৯৯২-এর ডিসেম্বরে মার্কিন মেরিন সোমালিয়ার সৈকতে নামার আগেই জিহাদী ইসলামী সংগঠনগুলো মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত ইরান-সুদান স্ট্রাটেজির দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। ইরান-সুদান স্ট্রাটেজির মূলকথা ছিল এই যে, গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে মার্কিন বাহিনীকে এমন অবস্থায় ফেলতে হবে যাতে সোমালিয়া তাদের জন্য একাটা ফাঁদ বা চোরাবালিতে পরিণত হয়। সোমালিয়ায় মার্কিন বাহিনীর ওপর আক্রমণের মহড়া হিসাবে দক্ষিণ ইয়েমেনের এডেনে কিছু কিছু মার্কিন স্থাপনার উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এসব স্থাপনা সোমালিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করেছিল।

ইয়েমেনে বিন লাদেনের ব্যাপক যোগাযোগ থাকায় এই আক্রমণের সার্বিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার হাতে অর্পিত হয়। সময়ের দিক থেকে প্রচন্ড চাপের মুখে কাজ করে বিন লাদেন আক্রমণ ত্বরান্বিত করার জন্য পুরানো ও পরীক্ষিত লোকজনকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। ইয়েমেনী "আফগানদের" অর্থাৎ আফগান যুদ্ধে অভিজ্ঞ ইয়েমেনের ইসলামী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে প্রধান আক্রমণকারী দল গঠন করা হয়। মূল পরিকল্পনায় এডেনে মার্কিন সৈন্যদের ব্যবহৃত কয়েকটি হোটেল এবং সমুদ্র ও বিমানবন্দরে মার্কিন স্থাপনায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যবস্থা ছিল। সকল বাধাবিপত্তি ও চ্যালেঞ্জের মুখে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করার জন্য ওসামা বিন লাদেন এডেনের শেষ সুলতান ও জিহাদী ইসলামী শেখ তারিক আল ফাদলিকে তার লন্ডন প্রবাস ছেড়ে ইয়েমেনে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযানের দায়িত্ব নিতে রাজি করান। ফাদলিকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি গোপনে ইয়েমেনের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়। সময় বাঁচানোর জন্য এই স্কিমের প্রয়োজনে বিপুল অঙ্কের অর্থ ইয়েমেনে বিন লাদেনের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

ডিসেম্বরের প্রথমদিকে 'ইয়েমেনী ইসলামিক জিহাদ' নামক সংগঠনের ছত্রছায়ায় আক্রমণকারী দল সংগঠিত হয়। প্রায় ৫শ উন্নত ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইয়েমেনী আফগানের মধ্য থেকে মূল জিহাদীদের বেছে নেয়া হয়। এরা ছিল তারিক আল ফাদলির প্রত্যক্ষ কমান্ডের অধীনে। তাদের মূল ঘাঁটি ছিল সাদাহ এলাকায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে বিন লাদেন ও ফাদলি এডেনে আগ থেকে ইসলামী জিহাদের যেসব ঘাতক স্কোয়াড ছিল তাদের দিয়ে স্থানীয় রাজনীতিকদের হত্যা এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে বোমা হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যান। ২৯ ডিসেম্বর ইসলামী জিহাদীরা এডেন হোটেল ও গোল্ডেন মুর হোটেলে বোমা বিষ্ফোরণ ঘটায়। এতে তিন আমেরিকান নিহত ও ৫জন আহত হয়। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে গোটা পরিকল্পনা জট পাকিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে। মার্কিন বিমানবাহিনীর পরিবহন বিমানগুলোকে লক্ষ্য করে আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয়ার সময় এডেন বিমানবন্দরের প্রান্তে রকেট লঞ্চারসহ জিহাদীরা ধরা পড়ে। অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর ৮ জানুয়ারি শেখ ফাদলি ও তার সহকর্মীরা এডেন কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা দেন। গোটা অভিযানের নেপথ্যে যে বিন লাদেন ছিলেন তা ফাঁস হয়ে যায়।

*সোমালিয়া: চূড়ান্ত আঘাতের প্রস্তুতি*

সোমালিয়ায় মার্কিনবিরোধী লড়াই শুরু হওয়ার আগে ১৯৯২-এর শেষভাগ থেকে ১৯৯৩ সালের প্রথমভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সুদান থেকে শুরু করে ইয়েমেন, সোমালিয়া ও ওগাদেন পর্যন্ত আফ্রিকা শৃঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী জিহাদীদের মোতায়েন সম্পন্ন হয়ে যায়। এদের মধ্যে ইরানের আল-কুদ্স বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট আফগানরা যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইয়েমেনের ইসলামিক জিহাদের এলিট ইউনিট। তার ওপর সমর পরিকল্পকদের চাপে ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তান থেকে আরও তিন হাজার আফগান যোদ্ধা নিয়ে আসেন। বলা বাহুল্য এই আফগানরা ছিল বিভিন্ন দেশের ইসলামী যোদ্ধা যারা আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এই আফগানরা তাদের সাথে ভারি অস্ত্রপাতি এবং জিহাদী কাজে ব্যবহার্য সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসেছিল, যার মধ্যে ছিল উচ্চশক্তির বিস্ফোরক, অত্যাধুনিক রিমোট কন্ট্রোল বোমা, বুবি-ট্রাপ পুতুল এবং কিছু স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র। এই আফগান এলিট ফোর্স ইয়েমেনের আল-মারাকিশাহ পর্বতাঞ্চলের সাদাহ এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে।

১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি সোমালিয়ার লড়াই বিস্তার লাভ করার মুখে বিন লাদেন অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামসহ এই আফগানদের বিমানযোগে দ্রুত ইয়েমেন থেকে সোমালিয়ায় স্থানান্তর করেন। পরে এক মিসরীয় সাংবাদিকের কাছে বিন লাদেন বলেছিলেন যে, ঐ অভিযানে তাঁর একান্তভাবে নিজের ৩০ লাখ ডলার ব্যয় হয়েছিল। একই সময় সরাসরি ইরানের নিয়ন্ত্রণাধীন ইরানী পাসদারান ও সোমালীয় জিহাদীদের সুদানে সংগঠিত করা হয়। যাতে করে তারা অতর্কিত সুইসাইড অভিযান চালানোর কৌশলে পারদর্শী সুদানী ইসলামিক ইউনিয়নের (ঝওটচ) ইউনিটগুলোকে সাহায্য সমর্থন যোগাতে পারে। তাছাড়া সোমালিয়ায় হস্তক্ষেপ করার জন্য আলাদাভাবে রেখে দেয়া বেশ কয়েক শ' আফগানকে সোমালিয়ায় পাঠানোর আগে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য লিবীয় সীমান্তের কাছে রাখা হয়। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি খার্তুমে জিহাদ বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে আফ্রিকা শৃঙ্গ পরিস্থিতির পার্যালোচনা করে সোমালিয়ায় জিহাদ বিস্তার করাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গ্রীন সিগনাল দেয়া হয়।

সেই বৈঠকে জেনারেল ফারাহ আইদিদের সিনিয়র কমান্ডাররাও অংশ নেন। এই বৈঠক পরবর্তী ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে আইদিদ ও তাঁর প্রধান সামরিক ও গোয়েন্দা সহকর্মীরা পর পর ইরান, ইয়েমেন, সুদান, ইথিওপিয়া ও উগান্ডা সফর করে মূল পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত হন। এ সময়ের দিকে শেখ আইদিদ খার্তুমে ইরাকী দূতাবাসে ইরাকী গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। বলাবাহুল্য তুরাবি ছিলেন এসব বৈঠকের আয়োজক। বাগদাদ আইদিদকে ব্যাপকভিত্তিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে বছরের বসন্তে মোগাদিসু অভিযান সাদ্দাম হোসেনের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে, তিনি তাঁর ছেলে কুসায়কে সোমালিয়া তথা আফ্রিকা শৃঙ্গে মার্কিনবিরোধী অভিযানে ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেন। খার্তুমে ইরাকী গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের এ সময় বলতে শোনা যায় যে, সাদ্দাম হোসেন সোমালিয় যুদ্ধে বড় ধরনের বিজয় অর্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন।

অচিরেই সাদ্দাম হোসেনের নিজস্ব স্পেশাল সিকিউরিটি এজেন্সির সদস্যসহ বেশকিছু গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞের আগমনে খার্তুমে ইরাকী দূতাবাস স্ফীত হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্যকারীর দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালের জুন মাসের মধ্যে ইরানী পাসদারান, লেবাননী হিজবুল্লাহ, আরব আফগান এবং সুদানের ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট, সোমালিয়ার

ঝওটচ, কেনিয়ার ইসলামিক রিপাবলিক অর্গানাইজেশন, ইসলামিক ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া ইসলামী জিহাদসহ তুখোড় ইসলামী জিহাদীদের বেশকিছু দল সোমালিয়ায় গোপনে মোতায়েনের কাজ সম্পন্ন হয়। তার ওপর বিন লাদেন নিয়ে আসেন বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামসহ প্রায় তিন হাজার মুজাহিদ সদস্য। সামগ্রিকভাবে এই ইসলামী বাহিনীর সিংহভাগ অংশ বিন লাদেনের সংগৃহীত খামারগুলোতে এসে জড়ো হয়। সেখানে তারা তাদের পশ্চাদবর্তী স্থাপনা গড়ে তোলে। এসব নিরাপদ আশ্রয় থেকে তাদেরকে অভিযান চালাতে পাঠানো হয়।গ্রিষ্মের প্রথমদিকে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর ইসলামী জিহাদীরা রাজধানী মোগাদিস্যুতে মার্কিন ও জাতিসংঘ বাহিনীর ওপর বোমা হামলাসহ বেশকিছু এ্যামবুশ শুরু করে।

১৯৯৩ সালের ৫ জুন এক বড় ধরনের এ্যামবুশ চালিয়ে তারা জাতিসংঘ বাহিনীর ২৩ সৈন্যকে হত্যা করে। স্থানে স্থানে মার্কিন ও জাতিসংঘ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এসব সংঘর্ষের আশু ও নাটকীয় প্রভাব পড়ে জেনারেল আইদিদের পতাকাতলে সমবেত ইসলামী জোটের শক্তি ও সংহতির ওপর। একটা একীভূত হাই কমান্ডের আবির্ভাব ঘটে।এই লড়াই চালাতে গিয়ে আইদিদ ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। পাশ্চাত্য বিশেষ করে মার্কিন বাহিনীর মোকাবালা করে তিনি বীরের আসন লাভ করেন। মার্কিন বিরোধী অভিযান চালানোর ফলে সোমালিয়ার অনেক ট্রাইব এবং রাজনৈতিক-সামরিক শক্তি আইদিদের সোমালী ন্যাশনাল এ্যালায়েন্সের (ঝঘঅ) নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশনে যোগ দেয় এবং আইদিদকে তাদের সর্বাধিনায়ক হিসাবে মেনে নেয়। এদিকে একটানা চোরাগোপ্তা হামলা ও বোমাবাজির জবাবে মার্কিন ও জাতিসংঘ বাহিনী প্রবল গোলাবর্ষণ শুরু করে। ফলে রাজধানী মোগাদিসুতে সংঘর্ষের ব্যাপক বিস্তার হয়।

১১ জুন আইদিদ ও তাঁর কয়েক সিনিয়র কমান্ডার খার্তুমে গিয়ে ‘পিপলস এ্যারাব এ্যান্ড ইসলামিক কংগ্রেস’-এর ছত্রছায়ায় এক গুপ্ত পরামর্শ সভায় মিলিত হন। তুরাবির সভাপতিত্বে এই সভায় সোমালিয়ায় জিহাদের বিস্তার ঘটানোর এবং ইসলামী জিহাদীদের সাহায্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই কংগ্রেসেই বিন লাদেন তুরাবির ইনার সার্কেলের অন্যতম উপদেষ্টা নির্বাচিত হন। বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মিসরীয় নেতা আইমান-আল-জাওয়াহিরিও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জুন মাসের খার্তুম বৈঠকের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এই যে, সোমালিয়ায় অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে বাগদাদকে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণের সবুজ সঙ্কেত দেয়া হয় এবং ভিয়েতনামে যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে গেরিলা যুদ্ধে টেনে আনার লক্ষ্যে ইরাকী-সুদানী-ইরানী সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

১৩ থেকে ২৫ জুন যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েক দফা বিমান হামলা চালায়। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সোমালী মিলিশিয়ারা প্রবল প্রতিরোধ দেয়। তারা মার্কিন স্থল সেনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং আইদিদকে ধরার জন্য ‘কোবরা’ গানশিপের অভিযানে ব্যর্থ করে দেয়। ওদিকে খার্তুম সম্মেলন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সারির বেশকিছু জিহাদ বিশেষজ্ঞ গোপনে সোমালিয়া এমনকি মোগাদিসুতে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করেন। জাওয়াহিরিকে সরাসরি সোমালীল্যান্ডে পাঠানো হয়। অন্যদিকে খার্তুমে ওসামা বিন লাদেন আরেকটি যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলছিলেন।

বলা যেতে পারে তিনি হাজার হাজার লোককে গোপনে সুদান থেকে তৃতীয় রাষ্ট্র ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া দিয়ে সোমালিয়ায় আনার সুবিশাল উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ মরুভূমির চরম বৈরী পরিবেশের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। গোটা উদ্যোগের জন্য বিন লাদেন ট্রাক ও জ্বালানি খাদ্য, পানি, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক ও মেডিক্যাল কিট প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ইতোমধ্যে সোমালিয়ায় ইসলামী জিহাদ অবকাঠামো সুসংহত হতে শুরু করেছে। তাঁদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মোগাদিসুর দক্ষিণে ওরং কিসমানু, বার্দাহিরি, মারকা ও গালকাইওতে। গালকাইও ছিল আইদিদের অন্যতম ঘাঁটি। ইরানী গোয়েন্দারা বোসাসোতে গোপনে ট্যাংকবিধ্বংসী ও বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র বসায়। এছাড়া ইরাকের এলিট স্ট্রাইক ফোর্স-আস সাইকা কমান্ডোর প্রায় ১২ শ' সদস্য সোমালিয়ায় মোতায়েন করা হয় মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক হামলায় অংশ নেয়ার জন্য। তার ওপর ইসলামী জিহাদ বিশেষজ্ঞদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও সংগঠিত প্রায় ১৫ হাজার সোমালী মার্কিনবিরোধী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল।

### *বিন লাদেনের চোখে যুক্তরাষ্ট্র*

১৯৯৩ সালের ১২ জুলাই মোগাদিসুতে মার্কিন হামলার পর পরই জেনারেল আইদিদ আহূত সিনিয়র কমান্ডারদের বৈঠকে বোসাসোয় মোতায়েন বিভিন্ন দেশের জিহাদী বাহিনীকে ব্যাপক তৎপরতা শুরুর নির্দেশ দেয়া হয়। সাহায্যকর্মীসহ মার্কিন ও জাতিসংঘ সেনাদের ওপর হামলা ঐ মাসে শুধু মোগাদিসুতে নয়, গোটা মধ্য সোমালিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সোমালী নাগরিকদের হত্যার বদলা নিতে আইদিদ অনুসারীদের যে কোন স্থানে মার্কিন বানীর ওপর আঘাত হানতে বলে দেয়া হয়। আইদিদ বাহিনী মার্কিন দূতাবাসে ও জাতিসংঘ অবস্থানে গোলাবর্ষণ করে। জুলাইয়ের গোটা সময় ধরে এই বিক্ষিপ্ত হামলা চলতে থাকে। প্রচার মাধ্যমে জেনারেল আইদিদকে ইচ্ছা করেই অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘসহ সবার দৃষ্টি আইদিদের কর্মকা- এবং বক্তব্য-বিবৃতির ওপর নিবদ্ধ তখন তারই ছত্রছায়ায় মোগাদিসু শহরে যুুদ্ধে নতুন অংশগ্রহণকারীর আগমণ হয়। এরা হল ভ্যান গার্ড অব দি সোমালি ইসলামিক স্যালভেশন। ৩ আগস্ট সংস্থা নিজস্ব বেতার ঘোষণায় ও প্রচারপত্রে 'শয়তান' মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ বিস্তারের জন্য সোমালীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। একই দিন শেখ আইদিদের বেতার ভাষণেও একই কথা উচ্চারিত হয়। ১৯৯৩ এর আগস্টের প্রথমভাগে আইদিদ বাহিনী ও তার মিত্ররা দক্ষিণ মোগাদিসুতে বড় ধরনের লড়াইয়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়। এ সময় সোমালী ইসলামিক স্যালভেশন মুভমেন্ট (ঝওঝঘ) যোদ্ধারা প্রথমবারের মতো মার্কিন সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিয়ে রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমার সাহায্যে চার মার্কিন সৈন্যকে হত্যা করে। এরপর আরও বেশকিছু অভিযান চালায়।

১৯৯৩ এর সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে সোমালী ইসলামিক ইউনিয়ন পার্টির (ঝওটচ) পতাকাতলে ইসলামী এলিট বাহিনী মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।৬ সেপ্টেম্বর তারা মোগাদিসুতে জাতিসংঘ অবস্থানে একের পর এক বহু হামলা চালায়। ৫ সেপ্টেম্বর এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আইদিদ বাহিনী জাতিসংঘ বাহিনীর ৯ নাইজেরিয়ান সৈন্য হত্যা করে। কোণঠাসা নাইজেরীয়দের উদ্ধারে মার্কিন সৈন্যদের ব্যাপক হস্তক্ষেপ এবং প্রচন্ড গোলাগুলি চালাতে হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর আইদিদ বাহিনীর সঙ্গে মার্কিন সৈন্যদের তুমুল লড়াই হয়। মার্কিন বাহিনী অসংখ্য অসামরিক নাগরিক হত্যা করে। এরপর শুরু হয় সহিংসতার বিরামহীন চক্র। ১৫ সেপ্টেম্বর আইদিদ ও মুজাহিদ বাহিনী দিনের বেলায় জাতিসংঘ সদর দফতরে মর্টার হামলা চালায়।

ইসলামী জিহাদীরা ও সোমালী ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স মার্কিন হেলিকপ্টার অ্যাম্বুশ করতে শুরু করে। ২৬ সেপ্টেম্বর মোগাদিসুতে একটা ব্ল্যাকহক গুলি করে ভূপাতিত করে। উৎফুল্ল সোমালী জনতা নিহত মার্কিন বৈমানিকের লাশ রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় টেনে নিয়ে যায়। ১৯৯৩ সালের শরতের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী জিহাদীদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ফলে সোমালিয়ায় সংঘর্ষের বিস্তার ঘটেছে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে,

মোগাদিসুকে আমেরিকানদের জন্য দ্বিতীয় বৈরুত বা দ্বিতীয় কাবুল বানানো। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ইসলামী জিহাদীরা পরিস্কার টের পেয়ে যায়, আমেরিকানরা মোগাদিসুর চোরাবালিতে আটকা পড়ে গেছে। এখন বাকি রয়েছে তাদের অবমাননার সঙ্গে বিদায় দেয়ার পালা। মোগাদিসুর লড়াইটা ছিল ইসলামিক ইন্টারন্যাশনালের জেনারেল কমান্ডের অধীনে পরিচালিত প্রথম বড় ধরনের লড়াই। হাসান আল-তুরাবি সার্বিক কর্মকান্ডের সিনিয়র নেতার ভূমিকায় আবির্ভূত হন।

আইমান আল জাওয়াহিরি, আবদুল্লাহ জাভেদ (আফগান) ও কামারুদ্দীন ধারবান (আলজিরীয়) সরাসরি তাঁর অধীনে থেকে সমরিক তৎপরতা চালান। ওসামা বিন লাদেন ছিলেন লজিষ্টিক্যাল সাপোর্টের দায়িত্বে। ১৯৯৩ সালের শরতে জাওয়াহিরি সরাসরি সোমালিয়ায় থেকে আইদিদের সিনিয়র সামরিক সহকর্মী হিসাবে কাজ করেন। সোমালিয়া যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড কমান্ডার জাওয়াহিরি তাঁর সঙ্গে সেখানে আলী আল রশিদীকে নিয়ে যান। তিনি আবু উবায়দা আল বানসিড়ি বা আবু উবায়দা আল বানজাসিড়ি নামেও পরিচিত। জাওয়াহিরির অতি বিশ্বস্ত বন্ধু আল রশিদী মিসরীয় পুলিশ বাহিনীতে ইসলামী জিহাদের গুপ্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৮১ সালে তাঁকে সাদাত হত্যাকান্ডের পর গ্রেফতার করা হয়। পরে ১৯৮৬ সালে তিনি সুকৌশলে আফগানিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি বিন লাদেনের বাহিনীতে যোগ দেন এবং দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যান। আল রশিদী ছিলেন লাদেনের ডান হাত।

১৯৯৩ সালে আল রশিদী মোগাদিসুতে জাওয়াহিরির এলিট ইউনিটগুলোর একটি ইউনিটের কমান্ডে ছিলেন। ইসলামী জিহাদীদের সমর্থনপুষ্ট সোমালীদের লড়াইয়ের শক্তি সামর্থ যে কি বিশাল আকারে বেড়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ হচ্ছে ১৯৯৩ সালের ৩ অক্টোবরের ঘটনা। ঐ দিন বিকালে মার্কিন সৈন্যরা জেনারেল আইদিদের দুই উপদেষ্টাসহ ২২ সোমালীকে বন্দী করলে প্রচন্ড লড়াই শুরু হয়ে যায়। সহস্রাধিক সোমালী যোদ্ধা মার্কিন সৈন্যদের ঘিরে ফেলে অ্যাম্বুশ করতে থাকে। তারা দু'টো মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে এবং একটানা ১১ ঘন্টা ধরে মার্কিন সৈন্যদের ওপর গুলি বর্ষণ করে চলে। ১৮ মার্কিন সৈন্য নিহত ও ৭৮ জন আহত হয়। পরদিন সোমালীরা মোগাদিসুর রাজপথে মার্কিন সৈন্যদের লাশ নিয়ে বিজয় উৎসব করে। ৩ অক্টোবরের লড়াইয়ে জাওয়াহিরি ও আল রশিদী দু'জনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বিশেষ করে অ্যাম্বুশগুলো আল রশিদীর সার্বিক কমান্ডে হার্ডকোর ইসলামী জিহাদীরা এবং প্রধানত আরব আফগান ও ইরাকীরা চালিয়েছিল। আরব আফগানদের মধ্যে আলজেরীয় ও মিসরীয় মুজাহিদরা ছিল। ইরাকীরা ভারি অস্ত্র, বিশেষ করে হেলিকপ্টার বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারে অংশ নিয়েছিল। ৩ অক্টোবরের লড়াইয়ের পর মার্কিন বাহিনীকে সোমালীয়া থেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়

। পরবর্তীকালে বেশ কিছু বিবৃতি ও সাক্ষাতকারে বিন লাদেন বলেছেন যে, সোমালিয়ার অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করেন। সোমালিয়াতেই প্রথম তিনি নেতৃত্বের পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন

এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের মতো জটিল বিষয়ে অংশ নেন। তিনি ইরান ও ইরাকের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মোগাদিসুর লড়াইয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না থাকলেও চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিলেন। বিন লাদেন মোগাদিসুর লড়াইকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর অন্যতম প্রধান সাফল্য বলে মনে করেন। এই সাফল্য থেকে তিনি স্থিরনিশ্চিত হন যে, যুক্তরাষ্ট্রকে সৌদি আরব ও পারস্য উপসাগর থেকেও হটিয়ে দেয়া সম্ভব। কেননা, যুক্তরাষ্ট্র তাঁর চোখে কাগুজে বাঘের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

### *সৌদি পাসপোর্ট বাতিল; বিন লাদেনের ছদ্মনাম ধারণ*

১৯৯৪ সালে বিন লাদেনকে বেশ কিছু কর্মসূচীর দায়িত্ব নিতে দেখা যায়। এ জন্য তাঁর বেশ কয়েকটা দেশ সফরে যাবার প্রয়োজন পড়ে। এসব সফরে গিয়ে  তিনি নিজেকে জটিল র্কাযক্রমের যোগ্য ব্যবস্থাপক ও দক্ষ সংগঠক হিসাবে প্রমাণ করেন। সেই কর্মসূচীগুলোর বেশিরভাগ আজও চালু আছে। পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর বন্ধু বা মিত্রদের কিংবা তাদের ইউরোপে রেজিস্টার্ড কোম্পানির ব্যক্তিগত জেট বিমান ব্যবহার করে তিনি নির্বিঘে যেখানে সেখানে যেতে সক্ষম হন। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর সৌদি পাসপোর্ট বাতিল হবার পর তিনি ভিন্ন নাম ধারণ করে সুদানী কুটনৈতিক পাসপোর্টে বিদেশ যাতায়াত করতে থাকেন। তবে পাশ্চাত্য ও স্থানীয় গোয়ান্দা সংস্থাগুলোর ক্রমবর্ধমান হুমকি সত্বেও বিন লাদেন জিহাদপন্থী মুসলিম নেতাদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কখনই নিজের আসল পরিচয় গোপণ করার চেষ্টা করেননি।১৯৯৩ সালের শেষ দিকে মুজাহিদরা বড়ধরনের বিজয় উৎসব পালন করে। কারণ, তারা আফ্রিকা শৃঙ্গ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে দিতে পেরেছে। কাজেই পরবর্তী বছরটি নিজ নিজ শক্তিকে পুনর্বিন্যস্ত ও সংগঠিত করাই ছিল বিন লাদেন ও তাঁর সহকর্মীদের জন্য সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ সময়।

সোমালিয়ার ঘটনার পর ইসলামী জিহাদ বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে অন্যতম মার্কিনবিরোধী ও পাশ্চাত্যবিরোধী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। সেই সঙ্গে ইসলামী জিহাদী ব্যবস্থায় নতুন কিছু দেশ সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। দেশগুলোর একটি হচ্ছে পাকিস্তান। এই সময় কাশ্মীরের প্রক্সি যুদ্ধে এবং আফগানিস্তানে পাকিস্তানের সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। উভয় ক্ষেত্রে বিন লাদেনকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করতে দেখা গেছে।পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হকের আমলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী শক্তিগুলো কি রকম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।এমনকি স্বয়ং জিয়াউল হকও দেশে শরয়ী আইন চালুর ব্যবস্থা করেছিলেন। জিয়াউল হকের মৃত্যুর কিছুদিন পর নির্বাচরে মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসেন বেনজীর ভুট্টো। পাশ্চাত্যপ্রীতি ও গণতন্ত্রের ধ্বজা ধারণ সত্বেও তিনি কতিপয় মৌলিক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারকে অনুসরণ করে চলেন।

যেমন  একটি হলো ইসলামী জোটের অন্যতম মুখ্য সদস্যে পরিণত হওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো চীনের নেতৃত্বে ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত ট্রান্সএশীয় অক্ষশক্তি তথা মার্কিনবিরোধী র‍্যাডিকেল জোটে সক্রিয় অবদান রাখা। সেই লক্ষে পাকিস্তান ইরান ও উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে স্ট্যাটিজিক সহযোগিতা জোরদার করে তোলে। পাকিস্তান এসব জোটে সুস্পষ্ট ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। সেটা হলো ইসলামাবাদ ইসলামী জোটের সামরিক শক্তির উন্নয়ন এবং পারমাণবিক অস্ত্র প্রযুক্তিসহ সকল ধরণের সমরাস্ত্রের উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হবে। অন্যদিকে পাকিস্তান আমেরিকার তৈরী অস্ত্রের খুচরা

অংশসহ পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইনী-বেআইনী উভয় পথেই সংগ্রহ করবে। পাকিস্তানে সরকারের আড়ালেও এক অদৃশ্য সরকার থাকে। ক্ষমতায় যে-ই আসুক তাকেই এই অদৃশ্য সরকারের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হয়। জিয়াউল হক বা বেনজীর বা নাওয়াজ শরীফ এদিক থেকে কোন ব্যতিক্রম নন।

আমাদের এখানে আলোচ্য সময়টি হলো ১৯৯৩-৯৪ সাল। এসময়ে পাকিস্তানে বেনজীর ভুট্টো আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। এসময় যুদ্ধোত্তর এবং উপসাগর যুদ্ধোত্তর পাকিস্তানের জন্য নতুন স্ট্যাটেজি নেয়া হয়। সেটা হলো ইসলামী ব্লক ও ট্রান্স-এশিয়ান এক্সিসের সঙ্গে আরও বেশি করে একীভূত হওয়া। পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ স্থির নিশ্চিত হন যে, এই দুটো জোটের মধ্যেই পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিহিত। তাই ইসলামী আন্দলনের পরবর্তী ধাপ নিয়ে আলোচনার জন্য হাসান আল তুরাবি ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে খার্তুমে পপুলার অ্যারাব এ্যান্ড ইসলামীক কনফারেন্স এর অধিবেশন আহবান করলে পাকিস্তান যে তাতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা জানিয়েছিল যে, ইসলামী বিশ্বের গতিপ্রকৃতি, চীনের পরিবর্তনশীল স্ট্যাটেজি এবং পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রেক্ষিতে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের সর্বোত্তম স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ইসলামাবাদ ইসলামের র‍্যাডিকেলপন্থীদের স্ট্র্যাটেজি অনুসরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সম্মেলনে বেনজীর ভুট্টো তাঁর এক উপদেষ্টা পাঠান, যিনি তুরাবি ও অন্যান্য মুসলিম নেতার সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে পিপলস পার্টির ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন এবং আশ্বাস দেন যে, এই দল ইসলামের সমালোচনা করবে না, ইসলামী আইন যতটুকু যা প্রবর্তিত হয়েছে তা তুলবে না এবং কাশ্মীরে ভারতবিরোধী জিহাদে দৃঢ় সমর্থন দেবে।

উপদেষ্টা আরো জানান যে, পাকিস্তান আফগানিস্তান সমস্যার ইসলামী সমাধান খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর।পপুলার অ্যারাব এ্যান্ড ইসলামিক কনফেরান্স অধিবেশনে আর্মড ইসলামিক মুভমেন্টের কাঠামোর মাধ্যে পাকিস্তানের ভূমিকা, বিশেষ করে ইসলামী সশস্ত্র সংগ্রাম তথা আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদের প্রতি ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সক্রিয় সাহায্য-সমর্থন দেয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধারা হয়। সরকারী পর্যায়ে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেনজীর ভুট্টোর দুই বিশ্বাসভাজন- সেনাবাহিনীর সাবেক চীফ অব স্টাফ ও ইরানে ঘনিষ্ঠ মিত্র জেনারেল মীর্জা আসলাম বেগ এবং আইএসআই এর প্রাক্তন প্রধান জেনারেল হামিদ গুল, যিনি আশির দশকের শেষ দিকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে বিদেশী মুজাহিদদের আগমনকে উৎসাহিত করেছিলেন। এঁরা দু'জনেই ছিলেন র‍্যাডিকেল ইসলামীদের ঘোর সমর্থক। তুরাবি কাশ্মীরী মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় পাকিস্তানের অঙ্গিকারকে অভিনন্দিত করেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক মহলের চাপ সত্ত্বেও পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণকার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেন। এবং এ ব্যাপারে গোটা মুসলিমবিশ্বের অব্যাহত সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা আশ্বাস দেন যে, আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদী তৎপরতার প্রতি সমর্থন বন্ধ বা হ্রাস করার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের চাপের কাছে ইসলামাবাদ নতিস্বীকার করবে না। তারা জোর দিয়ে বলেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অন্যান্য সাহায্য পাওয়ার জন্য পাকিস্তানকে অনেক সময় আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদীদের দমন করার কিংবা তাদের অবকাঠামো খর্ব করার ভান ধরতে হবে। তবে সেটা হবে কেবল লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জিহাদীদের প্রতি ইসলামাবাদের সাহায্য সমর্থন প্রসারিত হবে।

### *আবার আইএসআই*

খার্তুম সম্মেলনে পাকিস্তান যে ওয়াদা করেছিল তা রক্ষার জন্য পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসএই কোমর বেঁধে লেগে পড়ে। ১৯৯৪ সালে ইরানী গোয়েন্দা সংস্থা ভিভাক এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আইএসআই আফগানিস্তানে জিহাদী অবকাঠামোর, বিশেষ করে আরব ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ স্থাপনাগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটায়। আইএসআই ইন্সট্রাক্টরদের চারটি প্রশিক্ষণ শিবিরে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় যেখানে "বিদেশী আফগানদের" (অর্থাৎ আফগান নয় এমন বিদেশীদের) উন্নত অস্ত্র ব্যবহার কৌশল, অত্যাধুনিক বোমা ও বুবি ট্র্যাপ তৈরি এবং সুইসাইড অপারেশন পরিচালনার উপায় শেখানো হতো। এখানে "আইএসআই" প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এই জন্য যে, পরে দেখা যাবে কিভাবে আইএসআই-এর সঙ্গে বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। যাই হোক, আইএসআই ও ভিভাক-এর যৌথ উদ্যোগে যেসব প্রশিক্ষণ শিবিরের উন্নয়ন ও সাম্প্রসারণ ঘটানো হয় তার একটি ছিল আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে খোস্ত ও জাওয়ারের মধ্যবর্তী একটি এলাকায়। আশির দশকে আইএসআই এর প্রশিক্ষণ শিবিরটি আফগান মুজহিদ কমান্ডার জালালুদ্দীন হাক্কানীর জন্য চালাত।

১৯৯৮ সালে সেখানে প্রায় একশ' পাকিস্তানী এবং ৩০ জনেরও বেশি আরব ইন্সট্রাক্টর সারা বিশ্বের ৪০০ থেকে ৫০০ ইসলামী যোদ্ধাকে ট্রেনিং দিচ্ছিল। শিবিরটি সম্পূর্ণ পেশাদারী কায়দায় চালিত হয়। সেখানে প্রত্যেক প্রার্থীকে প্রশিক্ষণের জন্য গ্রহণ করার আগে আইএসআই বিশেষজ্ঞরা পূর্ণাঙ্গ শারীরিক, মানুষিক ও মেডিক্যাল পরীক্ষা নিত এবং নিরাপত্তামূলক তল্লাশি চালাত। বিষয়ভেদে কোর্সগুলো হতো ৪ মাস থেকে ২ বছর মেয়াদী। ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৩৫০ জন ছিল তাজিক (এদের ১০০ জন ছিল তাজিকিস্তানের এবং বাকিরা ছিল আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বঞ্চলের) ও প্রায় ১০০ জন ছিল চেচেন সৈন্য। এছাড়া ৩ টি গ্রুপ ছিল বসনিয়া-হারজেগোভিনার, ২টি গ্রুপ ছিল ফিলিস্তিনী, ১টি গ্রুপ ছিল ফিলিপিন্সী, ১টি গ্রুপ ছিল মোলদাভীয় এবং ২টি গ্রুপ ইউক্রেনীয় (প্রধানত ক্রিমীয় তাতার)। ছাত্রদেরকে ১২ থেকে ১৪ জনের একেকটি স্টাডি টিমের ভাগ করা হতো। নিরাপত্তার কারণে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ বা টিমের মধ্যে যোগাযোগ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। বিশেষ রাত্রিকালীন কোর্সও পরিচালনা করা হতো এবং এসময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি ও তৎপরতা বা কার্যক্রম গোপন রাখতে হতো। ১৯৯৮ সালের আগস্টের লাদেনের ঘাঁটিতে মার্কিন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সময় এ ধরনের কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবিরকেও টার্গেট করা হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে অপর যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ঘটানো হয় তার মধ্যেছিল গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিজবে ইসলামীর ঘাঁটি বলে পরিচিত চর সিয়াবের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এছাড়া পাশ্চাত্যে এবং পাশ্চাত্যপন্থী মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে বিশেষ ধরণের অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাছাই করে রাখা দু'শরও বেশি আরব যোদ্ধার জন্য আইএসআই আলাদাভাবে বড় ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও চালিয়েছিল। আইএসআই পরিচালিত অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আফগনিস্তানের বাকি অঞ্চলে ছড়ানো-ছিটানো ছিল।

১৯৯৪-৯৫ সালে জিহাদী সংগঠনগুলোর জন্য দেয়া লজিস্টিক্স গোয়েন্দা অর্থে ও অন্যান্য সাহায্যের বেশির ভাগই আইএসআই পৃষ্টপোষকতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানী সংগঠন যথা হরকত-উল আনসার ও মারকাজ আল দাওয়াত আল আরশাদের মাধ্যমে সরবরাহ করা হতো। ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান হরকত-উল আনসারের নেতারা গর্ব করে দাবি করেন যে, তাঁদের যোদ্ধারা কাশ্মীর, ফিলিপিন্স, তাজিকিস্তান, বসনিয়া-হারজেগোভিনাসহ বিভিন্ন স্থানে লড়ছে। ১৯৯৫ সালে মারকাজ-আল দাওয়াত আল

আরশাদও অনুরূপ দাবি করে জানায় যে, তাদের মুজাহিদরা কাশ্মীর ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র-পশ্চিম ইউরোপ, বসরিয়া ও চেচনিয়ায় তৎপর আছে। আফগানিস্তান সঙ্কটে পাকিস্তানের জড়িয়ে পড়া এবং সেখানকার বিশাল জিহাদী ব্যবস্থার লালান পালনে তার সাহয্য-সহায়তা যে শুধু ইসলামী সংহতির চেতনা থেকে হয়েছে তা নয়। এর মধ্যে জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারটাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে আফগানিস্তানের সড়ক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পথ সন্ধান করায় আইএসআই এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গোপন তৎপরতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আইএসআই কুশা-হেরাট কান্দাহার-কোয়েটা মহাসড়ক নিয়ন্ত্রণে এক উচ্চাভিলাষী কার্যক্রমে হাত দেয়। সাবেক সোভিয়েত মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিম ও দক্ষিণ আফগানিস্তান হয়ে এই সড়ক মিশে গেছে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক ব্যবস্থার সঙ্গে যে সড়ক ব্যবস্থা দেশের সর্ব প্রধান বন্দর করাচী পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এটা হলো মোটামুটি ভালো অবস্থায় থাকা একমাত্র স্টাট্যাজিক স্থল পথ যা পুনর্নির্মাণ করা হলে অপেক্ষাকৃত সহজে বিশাল বিশাল কনভয় এপথ দিয়ে বহন করা যেতে পারে। এই পথের সঙ্গে মধ্য এশিয়া থেকে তেল ও গ্যাসের পাইপ লাইন করাচী বন্দর পর্যন্ত নেয়া হলে পাকিস্তানের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তা হবে একান্তই গুরুত্বপূর্ন।

পাকিস্তান যে কোন মূল্যে এ গুরুত্বপূর্ণ স্থলপথটির ওপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ছিল। আইএসআই এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে সব কার্যক্রম চালায় বলা যেতে পারে তারই পরিণতি বা ফলস্বরূপ তালেবান শক্তিটির উত্থান ঘটে। পাকিস্তানের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিরুল্লাহ বাবর ১৯৯৮ সালে স্বীকার করেন যে, ১৯৯৪ সালে তারই নির্দেশনায় তালেবানদের সংগঠিত করা হয়েছিল। কথাটার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। তালেবানদের সৃষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধি ইসলামাবাদের সকল সরকার (এমনকি বেনজীর ভুট্টোর সরকার) কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে এবং সেই মিশন আইএসআই দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। এই তালেবানরাই এখন আফগানিস্তানের প্রায় গোটা এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। আমেরিকার প্রবল চাপ সত্ত্বেও এই তালেবানরা ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানের দিকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাকে রক্ষা করছে।

### *বলকান অঞ্চলে বিন লাদেন*

আফগানিস্তান, আফ্রিকাশৃঙ্গ এবং অন্যান্য এলাকার জিহাদীদের সংগ্রামের সঙ্গে যতই নিজের সংশ্লিষ্টতা থাকে না কেন ওসামা বিন লাদেন সৌদি আরবের তখনকার ক্রমবর্ধমান সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়ন থেকে নিজেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। বাদশাহ ফাহাদের স্বাস্থের দ্রুত অবনতি ঘটলেও তার স্থলে কে সিংহাসনে আরোহণ করবেন সে সম্পর্কে তখনও সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফলে উত্তরধিকার প্রশ্নে আল সৌদ রাজপরিবারের অংশীদারদের মধ্যে তিক্ত বিরোধ এবং তা থেকে উদ্ভুত সঙ্কট গ্রাস করে ফেলেছিল সৌদি আরবকে। শীর্ষ স্থানীয় শাহজাদাদের ব্যাপক দুর্নীতি ও অতৃপ্ত লোভ-লালসার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। জিহাদী ও র‍্যাডিকেল শক্তি এই বিক্ষোভ ও বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে সৌদি আরবে খাঁটি ইসলামী জীবনধারা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এটা মূলত ছিল ইসলামপন্থীদের আন্দোলন। রিয়াদ এ আন্দোলন মোকাবিলায় কঠোর ব্যবস্থা নেয়। ব্যাপক ধরপাকড় চালিয়ে তাদের বিনা বিচারে আটকে রাখে। এভাবে চরম দমননীতির দ্বারা আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয়। শাসকগোষ্ঠীর প্রতি এই আন্দোলন বাস্তব কোন হুমকি সৃষ্টি করতে পারেনি। সৌদি আরবের ভিতরের ও বাইরের এই পরিস্থিতি বিন লাদেনের রাজনৈতিক বিকাশের পথে একটা মোড় পরিবর্তন হিসাবে কাজ করে।

১৯৯৩-৯৪ সালে তিনি আল-সৌদ রাজপরিবারের এককভাবে দেশ শাসনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সব রকমের যুক্তি বিচার বিবেচনা করে তিনি স্থির নিশ্চিত হন যে, এই পরিবারটি দেশ পরিচালনার কোন বৈধতা নেই। তাই একদা যিনি সৌদি গোয়েন্দা সংস্থাকে অতুলনীয় সার্ভিস যুগিয়েছিলেন এবং উপসাগর সঙ্কটের সময় দৃঢ়ভাবে রাজপরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই এখন রাজপরিবারের ঘোরতর ও আপোষহীন শত্রু হয়ে দাঁড়ান। রিয়াদের প্রতি বিন লাদেনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এই বিবর্তনের ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে। তিনি এখন সৌদি আরবে ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করার উপায়, বিশেষ করে সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর উত্তরোত্তর দমন নিপীড়নের মুখে কি করে সেই আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখা এবং এর পাশাপাশি সৌদি আরবে ভবিষ্যত অভ্যুত্থানের অগ্রসেনা হিসাবে কিভাবে মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা যায় সে নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। বিন লাদেন অবশ্য এ ব্যাপারে সচেতন থেকেছেন যে শেষোক্ত দায়িত্বটি পালন করা যথেষ্ঠ দুরূহ এবং প্রচুর সময়সাপেক্ষ। ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী অভিযানের ভিত্তি রচিত হয়। হাসান আল তুরাবি ও তার আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনে বিন লাদেন ও জাওয়াহিরির মতো 'আফগান যুদ্ধাভিজ্ঞ' জিহাদী নেতাদের গুরুত্ব ও কার্যকরী ভূমিকার কথা বুঝতে পেরে তাদের অনেক বড় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেন। লাদেন ও জাওয়াহিরিকে মুখ্য অবস্থানে রেখে এক নতুন কমান্ড কাঠামো নির্মিত হয়। ইসলামী জিহাদ এখন ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

বিন লাদেন ও জাওয়াহিরি দু'জনেই বলকান অঞ্চল, বসনিয়া-হারজেগোভিনা ও কসোভোয় র‍্যাডিকেল ইসলামীদের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান দুটোই কাজে লাগিয়েছিলেন। খার্তুম ও লন্ডন থকে বিন লাদেন বলকান অঞ্চলে মানবিক ত্রাণ সংগঠনের নেটওয়ার্ক ব্যাপক আকারে সম্প্রসারিত করেন। সেই সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে গড়ে তুলেন সহায়ক ঘাঁটি। ঐ ত্রাণ সংগঠনগুলোই গোটা বলকান অঞ্চলে হাজার হাজার মুজাহিদ ধারণ করে আছে। কোন নির্দিষ্ট মানবিক সাহায্যে সংগঠন বন্ধ হলে, কোন ইসলামী জিহাদী গ্রেফতার বা বহিষ্কার হলে সামগ্রিক জিহাদী নেটওয়ার্কের ওপর লক্ষণীয় কোন প্রভাব পড়ত না। বিন লাদেন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এই নেটওয়ার্কটির যথেষ্ট নমনীয়তাও ছিল। প্রায়ই এক একটা সংগঠন অদৃশ্য হয়ে যেত। যে জায়গায় গজিয়ে উঠত নতুন সংগঠন। এছাড়া বিপুল সংখ্যক ছদ্মবেশী ইসলামী জিহাদী প্রায়ই এক সংগঠনের আনুগত্য ছেড়ে অন্য সংগঠনের আনুগত্য গ্রহণ করত। তার ফলে জিহাদীদের সন্ধান বের করতে পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উদ্যোগ বহুগুণ জটিল আকার ধারণ করত।

বলকান অঞ্চলে ইসলামী জিহাদীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও অন্যান্য তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে বিন লাদেন একটা গোপন অর্থ ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছিলেন। তার গড়া সামগ্রিক নেটওয়ার্কের তত্ত্বাবধান করার জন্য বিন লাদেন অন্তত একবার বসনিয়া, আলবেনিয়াসহ বলকান অঞ্চল সফরে গিয়েছিলেন যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে। অন্যদিকে আইমান আল জাওয়াহিরি বলকান অঞ্চলে বহু স্তরবিশিষ্ট ফরোয়ার্ড ও অনসাইট কমান্ড এ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম গড়ে তুলেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল বসনিয়ার মুসলমানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মুজাহিদদের অবদান রাখা এবং সেই সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদী তৎপরতা চালানো। তার কমান্ড পোস্টগুলোর মধ্যে অফ-সাইট পোস্টগুলো ছিল ইতালি ও বুলগেরিয়ায় এবং অন-সাইট পোস্টগুলো ছিলো ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হারজেগোভিনা এবং আলজিরিয়ায়। জাওয়াহিরি গোটা বলকান অঞ্চলে অতি সুদক্ষ জিহাদীদের বেশ কয়েকটি সেলও গড়ে তুলেছিলেন এবং যাবতীয় আর্থিক খরচের ব্যাবস্থা করেছিলেন বিন লাদেন।বিন লাদেন ও জাওয়াহিরি পশ্চিম ইউরোপে বেশ

কয়েকটি বড় ধরণের জিহাদী প্রকল্পেও জড়িত ছিলেন। পশ্চিম ইউরোপে তৎপরতা চালানোর সুবিধার্থে জাওয়াহিরি দাড়ি-গোফ কামিয়ে পাশ্চাত্যের পোষাক ধারন করে চেহারা একদম বদলে ফেলেছিলেন। জওয়াহিরির ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্কের মূল লক্ষ্য ছিল জরুরী পরিস্থিতিতে খুবই মারাত্মক ধরনের জিহাদী তৎপরতা পরিচালনা ও তত্ত্বধানের জন্য যথাস্থানে অতি সুযোগ্য লোক নিয়োগ করা।

### *ফিলিপিঙ্গে জিহাদ বিস্তারে লাদেন*

ফিলিপিঙ্গে ইসলামী জিহাদের বিস্তারে বিন লাদেনের প্রভূত অবদান আছে। বলা যেতে পারে এ কাজে তিনি নিজেই জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে বিন লাদেন জিহাদী কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় শুরু করেন। তারই অংশ হিসাবে প্রথমে যে বড় ধরনের নেটওয়ার্কে তিনি সাহায্যকারীর ভূমিকায় জড়িত ছিলেন পরবর্তিকালে সেটি ফিলিপিঙ্গে বেশ কিছু অভিযান চালিয়ে একাধারে ত্রাস ও চমক সৃষ্টি করেছিল। গ্রাউন্ডওয়ার্ক তৈরির জন্য বিন লাদেন সেই ১৯৯৩ সালের শীতকালেই ফিলিপিঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপগুলোর মুসলিম জনগোষ্ঠিকে সাহায্য করতে আগ্রহী একজন ধনাঢ্য সৌদি বিনিয়োগকারী হিসেবে হাজির করেন। এ উদ্দেশ্যে সেখানে বেশ কিছু সম্পত্তি কেনেন, ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলেন। এসব কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য সরকারী কর্মকর্তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। যাই হোক, এভাবেই ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীর ছদ্ম পরিচয়ে লাদেন ফিলিপিঙ্গ নেটওয়ার্কের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরবর্তীকালে বিন লাদেনের অবাধ যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠলে এ দায়িত্বটা তিনি তাঁর শ্যালক মোহাম্মদ জেএল খলিফার কাছে হস্তান্তর কারেন। প্রয়োজনীয় অর্থ এখন কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকে।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে খলিফাকে ইমিগ্রেশন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সানফ্রানসিসকোতে আটক করা হয়। ১৯৯৪ সালের প্রথম দিক থেকে তুখোড় জিহাদীদের বেশ কিছু "সেল" যাদের সিংহভাগই হলো আরব "আফগান" তারা ফিলিপিঙ্গে এসে দেশের সর্বত্র, বিশেষত বড় বড় শহরে ঘাঁটি গেড়ে বসে। এদের মধ্যে সিনিয়র কমান্ডার ছিলেন রামজী আহমদ ইউসুফ। ১৯৯৩ সালে নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার গোটা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেছিলেন তিনি। ইউসুফের নেতৃত্বে আগত এই দলটির লক্ষ্য ছিল পূর্ব এশিয়ায় জিহাদী হামলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে জিহাদী হামলা পরিচালনার জন্য ফিলিপিঙ্গকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা। প্রথম দিকে নেটওয়ার্কটি কিছু তড়িঘড়ি কাজ করে বসে বলে সাফল্য পায়নি। যেমন ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের ম্যানিলা সফরকালে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। তবে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা কর্ডন ভেদ করার জন্য আগে থেকে যে সব গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার দরকার ছিল নেটওয়ার্ক তা করতে পারেনি। এবং পারেনি বলেই হত্যার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পূর্ব এশিয়ায় বড় ধরনের যে সব অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল পোপ পলকে হত্যা করা এবং একই সঙ্গে দু'টো যাত্রীবাহী মার্কিন বিমান বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়া। নেকওয়ার্কটি ফিলিপিঙ্গের সবচেয়ে বড় ইসলামী জিহাদী সংগঠনের নেতা আবু সায়াফকে ম্যানিলা সরকারের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম জোরদার করে তুলতে অত্যাধুনিক অভিযান পরিচালনায় সাহায্য করারও পরিকল্পনা করেছিল। ১৯৯৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর ইসলামী জিহাদী নেটওয়ার্কের সদস্য রামজী ইউসুফ সেবু থেকে টোকিও গামী ফিলিপিঙ্গ এয়ারলাইঙ্গের একটি যাত্রিবাহী বোয়িং ৭৪৭ বিমানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। জাল ইতালীয় পাসপোর্টে যাত্রীর ছদ্মবেশে বিমানে উঠে ইউসুফ নিজে বোমাটি পেতে রেখে ম্যানিলায় যাত্রা বিরতিকালে নিরাপদে নেমে যান। বিমানটি ওকিনাওয়ার

আকাশে থাকাকালে বোমা বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু ওটা খুব ছোট তথা স্বল্পশক্তির ছিল বলে বিস্ফোরিত হলেও বিমানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়নি। এরপর ইউসুফের সহযোগী সাইদ আকরাম দু'তিন স্থান থেকে হংকং অভিমুখী দু'টো মার্কিন বোয়িং ৭৪৭ মিমানে একই সঙ্গে মধ্য আকাশে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু লাদেনের ঐ নেটওয়ার্কটি ভেঙ্গে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা কর্যকর করা যায়নি। নেটওয়ার্কটির ভাগ্যই ছিল মন্দ।

১৯৯৫ সালের জানুয়ারীতে ম্যানিলায় পোপের প্রাণনাশের চেষ্টাও একইভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। বোমা তৈরির সময় উপাদান মিশ্রণে কোন ভুল হয়ে থাকবে যে কারণে বিষাক্ত ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। এ অবস্থায় ইউসুফ ও অন্যান্য জিহাদী তাদের এ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে সাইদ আকরাম ধরা পড়েন। ইউসুফ সহ অন্যরা থাইল্যান্ডে পালিয়ে যান। সেখান থেকে যান পাকিস্তানে। সিআইএ এসব তথ্য নিখুঁতভাবে যোগার করেছিল। এমনকি ইউসুফ কোন যায়গায় লুকিয়েছিল সে তথ্যটিও। ইউসুফের আত্মগোপন স্থলটি ছিল একটা এ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স। বিন লাদেনরই একটি কোম্পানী ওটা ভাড়া নিয়েছিল। মার্কিন সরকার এসব সুনির্দিষ্ট তথ্য ইসলামাবাদের কাছে পেশ করলে ইসলামাবাদের সহযোগীতা করা ছাড়া বিকল্প আর কিছু ছিল না। নইলে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তালিকায় ফেলতে পারত। মার্কিন-পাকিস্তানী আইন প্রয়োগকারী দল ইউসুফকে ধরতে গেলে ঐ এ্যাপার্টমেন্টে বসবাসরত ইউসুফের আর সকল কমরেড ও জিহাদীকে আইএসআই আগেই সরিয়ে ফেলে। শুধু ইউসুফ ধরা পড়ে। তাকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়া হয়।

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে ফিলিপিঙ্গ পুলিশ ম্যানিলার শহরতলিতে ইসলামী জিহাদীদের আরেকটি "সেল" ভেঙ্গে দেয়। এরা প্রধানত ছিল আরব "আফগান"। এভাবে বড় ধরণের কোন অভিযান পরিচালনা করতে পারার আগেই স্রেফ দুর্ভাগ্যবশত ফিলিপিঙ্গ নেটওয়ার্কটি ধসে পড়ে। এ অবস্থায় লাদেন ফিলিপিঙ্গ অভিযানকে পিছনে রেখে জিহাদের বিস্তার ঘটানোর জন্য এবার পাড়ি জমান মধ্যপ্রাচ্য।

*করাচী- বিন লাদেনের আরেক কেন্দ্র*

ইসলামী জিহাদীরা নব উদ্যমে আঘাত হানার জন্য ভিতরে ভিতরে যে শাণ দিচ্ছে কিছু কিছু দেশের গোয়েন্দা সংস্থা একেবারে টের পায়নি এমন নয়। বাতাসে এমন ঘ্রাণ পেয়েছিলেন সৌদি গোয়েন্দা সংস্থাপ্রধান শাহাজাদা তুর্কি বিন ফয়সলও। সম্ভাব্য জিহাদী হামলারোধে তিনি জরুরী কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। সৌদি আরবের সতর্কতা অবশ্য ওর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাদশাহ ফাহাদের নির্দেশে শাহাজাদা তুর্কি ১৯৯৫ সালের মার্চের প্রথমদিকে পাকিস্তানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর সঙ্গে সরাসরি এসব প্রসঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, সৌদি "আফগান"রা পাকিস্তান-আফগানিস্তানের ভিতরে-বাইরে যেভাবে তৎপরতা চালাচ্ছে সেটা সবিশেষ উদ্বেগজনক। তিনি আরও বলেন "গোটা ইসলামী জিহাদী অবকাঠামোর চাবিকাঠি হলো পাকিস্তান। কারণ, আফগানিস্তানে জিহাদ প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো এখনও আইএসআই নিয়ন্ত্রণ করছে। সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, হরকত-উল-আনসারের পতাকা তলে বিদেশে জিহাদ পুনরুজ্জীবনের জন্য জোর সাংগঠনিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এই হরকত-উল-আনসার ও আইএসআই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আছে।" শাহাজাদা তুর্কি একটা সমঝোতার প্রস্তাব দিলেন বেনজীরকে। বললেন যে, আইএসআইকে দিয়ে এই ইসলামী জিহাদীদের বিশেষ করে সৌদি আফগানদের রাস টেনে

ধরতে হবে, বিনিময়ে সৌদি আরব উদার হস্তে পাকিস্তানকে অর্থিক সাহায্য করা ছাড়াও পাকিস্তানী স্বার্থের পক্ষে ওয়াশিংটনের কাছে লবিং করবে। সোজা কথায় পাকিস্তানের প্রতি সুর নরম করার বিশেষ করে প্রেসলার সংশোধনী বাতিল করার জন্য ওয়াশিংটনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাকিস্তানের লাগামহীন পারমাণবিক কর্মসূচীর কারণে সে সময় প্রেসলার সংশোনীর নামে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সব ধরণের সামরিক সাহায্যদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। বেনজীর ভুট্টো রিয়াদকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রিয়াদও ১৯৯৫-এর এপ্রিলে বেনজীরের যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে পাকিস্তানের পক্ষে জোর লবিং করেছিল। শাহাজাদা তুর্কির বিশেষ প্রতিনিধি এ সময় বারকয়েক ইসলামাবাদে গিয়ে সিনিয়র আইএসআই অফিসারদের সঙ্গে কথাও বলেন। কিন্তু বেনজীরের দিক থেকে সহযোগিতার অঙ্গীকার থাকলেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সৌদি আরবের অনুরোধ পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেনি। এদিকে মার্চের শেষ দিক থেকে এপ্রিলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত খার্তুমে আবার অনুষ্ঠিত হয় পপুলার এ্যরাব এ্যান্ড ইসলামিক কনফারেন্স যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে উসামা বিন লাদেনও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে পাকিস্তান পরিস্থিতি জিহাদপন্থী নেতাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আইএসআই প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সমস্যা এবং অন্যদিকে সৌদি আরবের আকর্ষণীয় অফারের কথা উল্লেখ করেন।



জিহাদপন্থী নেতারা পাকিস্তান-মার্কিন বিরোধকে তাদের সার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তারা বেনজির ভুট্টোর সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা আরো বাড়িয়ে দেবার অঙ্গিকার করেন। বিনিময়ে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদী আন্দোলনে গোপনে অর্থ সংস্থানের কেন্দ্র হিসাবে করাচীকে আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহারের সুযোগ দিতে রাজি হয়। ঠিক হয় যে আর্থিক লেনদেনের এই নতুন কেন্দ্রটি চালাবেন বিন লাদেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জিহাদী নেটওয়ার্কের কাছে নগদ অর্থ গোপনে পৌঁছে দিবে এই কেন্দ্র। এটি মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু পাকিস্তানী ভূস্বামী, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীর সাথে যুক্ত থাকবে। যাতে করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের কন্ট্রাক্টগুলোকে কাজে লাগানো যায়। এ কেন্দ্রের সঙ্গে যে ওসামা বিন লাদেন জড়িত তা অনেকেরই বহুদিন জানা ছিল না।

### *টার্গেট এবার সৌদি রাজতন্ত্র*

১৯৯৫ সালে মিশর ও সৌদি আরব সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদীদের বিরামহীন ও নিরলস প্রচারাভিযান শুরু হয়। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে চলে চরম সহিংসতা ও ধামাকার কিছু ক্ষণস্থায়ী কার্যকলাপ। সামগ্রিকভাবে এসবের প্রভাব এই দুই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিরি ওপরও এসে পড়ে। ১৯৯৫ সালে এসব ঘটনা চলাকালে ওসামা বিন লাদেন বিশিষ্ট র‍্যাডিকেল ইসলামী নেতা হিসাবে নিজের আসন সুসংহত করে তোলেন। ১৯৯৫ সালের শুরুতে ওসামা বিন লাদেন খার্তুমে তুরাবির আর্মড ইসলামীস্ট মুভমেন্টের হাইকমান্ডের সদস্য হিসাবে কাজ করছিলেন। যে সমান্য ক'জন বিশ্বাসভাজনকে নিয়ে তুরাবির নিজস্ব একটি কোটাবি ছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর মতামত ও পরামর্শ চাওয়া হতো। তুরাবির ইনার সার্কেলের একজন হিসাবে লাদেন আরব বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই মিত্র মিসর ও সৌদি আরবের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আর তুরাবির ছায়া তলে থাকা অবস্থায় লাদেন ইসলামী আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলনের ক্ষমতার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামী জিহাদের

নেতৃত্বের কাতারে অন্যরাও উঠে আসছিলেন। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে বলতে হয় আইমান আল-জাওয়াহিরি ও তার অধীনস্থ মিসরের সিনিয়র জিহাদী কমান্ডারদের নাম।

১৯৯৮ সালের শেষ দিকে জাওয়াহিরি হয়ে দাঁড়ান বিন লাদেনের প্রধান জিহাদী কমান্ডার।র‍্যাডিকেল ইসলামী নেতারা সৌদি আরবে জিহাদী অভিযান শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই কারণে যে, তাঁরা স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন সৌদি আরবে এই ধরনের একটা জোয়ার সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা বিরাজ করছে। আর মিসরের বেলায় তাঁদের এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ হলো তাঁরা জানতেন যে, মিসরকে অন্য কোনভাবে ব্যতিব্যস্ত না রাখা গেলে মিসর সরকার জিহাদপন্থী ইসলামীদের কার্যক্রম, আক্রমণ বা ধামাকার মুখে সৌদি আরব বা অপর কোন রক্ষণশীল আরব সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য হস্তক্ষেপ করে বসতে পারে। সৌদি আরবে জিহাদের বিস্তার আসলে ছিল সৌদি সমাজের অভ্যন্তরে তীব্র হয়ে ওঠা এক সঙ্কটের প্রত্যক্ষ ফল এবং সঙ্কটের প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে ছিল অহিংস। উত্তরাধিকার ও রাজতন্ত্রের শাসনের বৈধতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই সঙ্কট এমন এক বিন্দুতে পৌঁছে যখন র‍্যাডিকেল ইসলামীরা স্বশস্ত্র সংগ্রাম শুরুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

১৯৯৪ সালে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি স্বনামধন্য ইসলামী আদর্শ প্রচারক শেখ সালমান-বিন-ফাহাদ আল-উদাহর গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সঙ্কটের শুরু। শেখ উদাহ হচ্ছেন একজন তরুণ জনপ্রিয় নেতা, যিনি বেদুইন সমাজ থেকে উঠে এসে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এবং মোটামুটি ভাবে সকল সৌদি নাগরিকের আস্থা ও সমর্থন পেয়েছিলেন। আসলে এ ধরনের নেতা শেখ উদাহ একা ছিলেন না, আরও অনেকেই ছিলেন। এঁরা বিন লাদেনের জেনারেশনের সঙ্গে গড়ে উঠেছিলেন। এঁরা আফগান যুদ্ধে অংশও নিয়েছিলেন। ইসলামী জিহাদীদের এক গোপন নেটওয়ার্কের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন।

১৯৯৪ সালের মধ্যে এই ইসলামী জিহাদীরা এবং অন্যান্য আরব ও ফিলিস্তিনী জিহাদী সংগঠন একদিকে সৌদি গুপ্ত পুলিশের সার্বক্ষণিক হুমকির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার এবং অন্যদিকে আল-সৌদ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জিহাদী সেলগুলোর এক শিথিল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। ওসামা বিন লাদেনও ছিলেন সৌদি আরবের তৃণমুল ইসলামী আন্দোলনের এক নেতা। আফগানিস্তানে মুজাহিদ নেতা হিসাবেও তাঁর অতুলনীয় ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকা সবারই জানা ছিলো। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর লিখিত ও টেপ রেকর্ড করা বক্তৃতামালা গোপন ইসলামী সংগঠনগুলো সৌদি আরব জুড়ে বিলি-বন্টন করে। নীতির প্রশ্নে তাকে ব্যক্তিগতভাবে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। সম্পদ হারিয়েছেন। নির্বাসিত জীবনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এসব বিষয় তাঁর মর্যাদা, তাঁর ভাবমূর্তি বাড়ার সহায়ক হয়েছে। সুদানে নির্বাসিত থাকাকালেও বিন লাদেন সৌদি আরবের ইসলামী জিহাদীদের পরিত্যাগ করেননি। বরং নানাভাবেই তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন।

তৃণমূল পর্যায়ের নেতা শেখ উদাহের গ্রেফতার সৌদি সমাজের অভ্যন্তরে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। গ্রেফতারের কয়েকদিন পর সৌদি আরবের অভ্যন্তরে ব্রিগেড অব ফেইথ নামে একটি ইসলামী জিহাদী সংগঠন প্রথম ইশতেহার ছাড়ে। তাতে সৌদি সরকারের উদ্দেশ্যে চরমপত্র ঘোষণা করে বলা হয় যে, পাঁচ দিনের মধ্যে শেখ উদাহকে মুক্তি দেয়া না হলে এই সংগঠন সৌদি ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদ অভিযান শুরু করবে। ইশতেহারে বলা হয়, “গোটা আরব উপদ্বীপ আমাদের জিহাদী তৎপরতার জন্য মুক্তাঙ্গনে পরিণত হয়েছে।” শেখ উদাহ নিজেও এই সশস্ত্র জিহাদ অনুমোদন করেছিলেন।

১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে জেলে থাকা অবস্থাতেও শেখ উদাহ আল-সৌদ রাজপরিবারের শাসকদের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদীদের বিক্ষোভ জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে বাণী বদ্ধ টেপ গোপনে জেল থেকে বাইরে পাচার করেন। এমনি একটি টেপে সৌদি রাজপরিবারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদও ঘোষণা করা হয়। এমনি হাজার হাজার বেআইনী ক্যাসেট গোপনে গোটা সৌদি আরবে বিলি করা হয়।

১৯৯৫ সালের ১০ এপ্রিল "ইসলামিস্ট চেঞ্জ মুভমেন্ট" নামে আরেক ইসলামী জিহাদী সংগঠন আরব উপদ্বীপজুড়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে আল-সৌদ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে আসন্ন সশস্ত্র হামলা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়। ইশতিহারে পাশ্চাত্য বাহিনীকে ১৯৯৫ সালের ২৮ জুনের মধ্যে আরব উপদ্বীপ ত্যাগের শেষ সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়, অন্যথায় এ তারিখ থেকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী জিহাদের ন্যায়সঙ্গত টার্গেট হয়ে দাঁড়াবে। ইশতেহারে অভিযোগ করা হয় যে, সৌদি রাজপরিবার ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে ক্রুসেডের শক্তির সেবায় নিয়োজিত হয়েছে, যার প্রমাণ হলো ইসলামের বিশিষ্ট প্রচারক ও শিক্ষকদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সৌদি আরবের ইসলামী জিহাদী শক্তিগুলো সৌদি শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য জিহাদ শুরু করাকেই একমাত্র সম্ভাব্য পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিল। এই হুমকিটা নিছক কাগুজে হুমকি ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার যোদ্ধার এক ইসলামী মুজাহিদ বাহিনী গড়ে উঠেছিল সৌদি আরবে। তার ওপর ছিল আফগান যুদ্ধ প্রত্যাগত ৫ হাজারের ওপর সৌদি মুজাহিদ, যারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও অস্ত্রসজ্জিত হয়েছিল ইরান, সুদান, ইয়েমেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে। এছাড়া সৌদি আরবের অভ্যন্তরে এক বিশাল ইসলামী আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক এই সৌদি মুজাহিদদের সমর্থন করার জন্য পস্তুত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলামী জিহাদীরা তাদের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। কেন, সে প্রসঙ্গ পরবর্তী পর্বে আলোচিত হবে।

### *হোসনী মোবারককে হত্যার চক্রান্তে বিন লাদেনও ছিলেন*

১৯৯৫ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদী নেতারা আরও বড় ধরণের এক অভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আর সে অভিযান হলো মিসরের বিরুদ্ধে। নিরাপত্তার কারণেই সৌদি র‍্যাডিকেল ইসলামীরা আগে থেকে এ অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। যে কোন আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলনকে জানাজানি হয়ে পড়ার, ধরা পড়ার, নির্যাতন ও বিশ্বাসঘাতকতার হুমকির মধ্য দিয়ে চলতে হয়। তাই এক জিহাদী গ্রুপের পরিকল্পিত অভিযান অপর জিহাদী গ্রুপ আগে থেকে জানতে পারে না। জানা সম্ভবও নয়। খার্তুম ও তেহরান থেকে সৌদি জিহাদীদের শুধু জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের রাজতন্ত্রবিরোধী অভিযানে আপাতত ক্ষান্ত হতে হবে। জিহাদী ব্যবস্থার কঠোর শৃঙ্খলার কারণে সৌদিরা বিনা বাক্যব্যয়ে সে নির্দেশ পালন করেছিল।

১৯৯৫ সালের ২৬ জুন ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মেবারকের প্রাণনাশের চেষ্টা চালানো হয়। প্রেসিডেন্ট মোবারক প্রাণে বেঁচে যান। তাঁর হত্যাকান্ডের মধ্যে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা মিসরে ইসলামী জিহাদ প্রভাবিত যে গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল, সেটাও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তথাপি ঘটনাটি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। এবং গোটা অঞ্চলে ইসলামী জিহাদের জোয়ার সৃষ্টিতে বড় ধরনের প্রেরণা যোগায়। মিসরের ইসলামী জিহাদীরা ও তাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রগুলো হোসনী মোবারককে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

**১৯৮১** সালে তাঁর পূর্বসূরি আনোয়ার সাদাত ইসলামী জিহাদীদের হাতে নিহত হন। তারা আশা করেছিল এই হত্যার ফলে সরকারের অবস্থা নড়বড়ে হয়ে যাবে এবং ইসলামী শক্তিগুলোর অভ্যুত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু তা হয়নি হোসনী মোবারকের কারণে। তিনি শুধু সরকারকে স্থিতিশীলতাই দেননি, উপরন্তু ইসলামী জিহাদীদের ওপর হিংসাত্মক দমন-নিপীড়নও চালিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে মিসর ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি রক্ষাই শুধু করেনি, উপসাগর যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর পক্ষে বলিষ্ঠভাবেও দাঁড়িয়েছিল। তদুপরি মোবারক বার বার বলেছিলেন যে,র‍্যাডিকেল ইসলামীদের চ্যালেঞ্জের মুখে তিনি যে কোন রক্ষণশীল আরব সরকারকে সমর্থন দিতে বদ্ধপরিকর। এর জন্য যদি মিসরীয় সেনাবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হয় তা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। সুতরাং হোসনী মোবারককে মেরে ফেললে নানা দিক দিয়ে লাভ হতে পারত ইসলামী জিহাদীদের।আদ্দিসে আবাবায় মোবারকের প্রাণনাশের চেষ্টাটি ছিল ইসলামী জিহাদী আন্দোলন এবং পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রগুলোর সর্বোচ্চ পর্যায়ের দীর্ঘ আলোচনার ফল। ওসামা বিন লাদেন এসব আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। আক্রমণটা যদিও চালিয়েছিল শেখ ওমর আব্দুর রহমানের সংগঠন আল জামাহ আল ইসলামীয়া। তথাপি গোটা অভিযানটি প্রকৃতপক্ষে ছিল আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফসল। এবং তার মধ্যে তুরাবির সুদানের অবস্থান ছিল সর্বাগ্রে। সমগ্র মিসরে ইসলামী সশস্ত্র সংগ্রামের সার্বিক বিস্তারে সুদান প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

**১৯৯৪** সালের শরতের শুরু থেকেই তেহরান, খার্তুম এবং আর্মড ইসলামিক মুভমেন্টের  নেতৃবৃন্দকে বার বার প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারকের হত্যা পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখা যায়। **১৯৯৪** সালের নভেম্বরে মোবারকের ইতালি সফরের সময় তাকে হত্যা করার জন্য ইতালি এবং বসনিয়া-হারজেগোভিনায় ইসলামী জিহাদী নেটওয়ার্ককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ইতালিতে ইসলামী নেটওয়ার্কের ওপর পাশ্চাত্যের নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া নজর থাকায় ষড়যন্ত্রটা ফাঁস হয়ে যায় এবং সেটা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। এরপর খার্তুমের নির্দেশে মোবারককে হত্যা এবং ইসলামীদের গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য খোদ মিসরের একটি ইসলামী জিহাদী নেটওয়ার্কের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

**১৯৯৫** এর জানুয়ারীর প্রথম তিন সপ্তাহে নেটওয়ার্কের সদস্যরা মোবারককে হত্যার জন্য তিন তিনবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ধরা পড়ার ভয়ে জিহাদী দলের প্রধান নেতারা অন্যান্য আরব দেশ হয়ে সুদানে পালিয়ে যায়। মিসরের অন্যান্য ইসলামী সংগঠন, যাদের সঙ্গে এই হত্যা প্রচেষ্টার কোন রকম সংস্রব ছিলনা তাদের ওপর মিসরীয় নিরাপত্তা বাহিনীর নির্মম আঘাত এসে পড়ে। কিন্তু প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার এমনি একের পর এক চেষ্টা চলছে এটা প্রকাশ হয়ে গেলে সরকারের স্থিতিশীলতা ক্ষুণ হবে আশঙ্কা করে কায়রো গোটা ব্যাপারটাই চেপে গিয়েছিল। ওদিকে মিসরীয় জিহাদীরা সুদানে পালিয়ে আসার পর আর্মড ইসলামীক মুভমেন্টের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এবং ইরানের প্রতি গোয়েন্দা বিশেজ্ঞরা  প্রেসিডেন্ট মোরাককে হত্যার চেষ্টা কেন বা কোন ত্রুটির কারণে বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখেন। ইরানী বিশেষজ্ঞরা অভিমত দেন যে, মিসরের ইসলামী জিহাদী নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন চুপিসারে ঢুকে পড়েছে। তাই আগে থেকে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে তাদের পরিকল্পনা। এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও একইভাবে ফাঁস হতে বাধ্য। সুতরাং ভবিষ্যত অভিযানে (মোবারক হত্যা) সর্বোচ্চ মাপের জিহাদী নেটওয়ার্ক কাজে লাগাতে হবে এবং দ্বিতীয়ত সেই অভিযান মিসরের ভিতরে হলে চলবেনা। বাইরে হতে হবে। কারণ স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলোকে আর পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে

না। এসব অভিমত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে তুরাবি পরবর্তী কৌশল নির্ধারণের আগে বিষয়টি নিয়ে মিসরের ইসলামী জিহাদী বাহিনীগুলোর বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন।

এ উদ্দেশ্যে তুরাবি ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে খার্তুমে তিন শীর্ষ মিসরীয় কমান্ডার ডাঃ আইমান আল জাওয়াহিরি (আল-জিহাদ), মোস্তফা হামজা (আল-জামাহ আল ইসলামিয়া) এবং রিফাই আহমদ তহা (আল জামাহ আল ইসলামিয়া) এর সঙ্গে আলোচনার জন্য জরুরী বৈঠক ডাকেন। এই তিন নেতার মধ্যে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা ঠিকই তুরাবির এ জরুরী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মিসরে ইসলামী বিপ্লব শুরু করার পথে সমস্যা ও অন্তরায়, এর সার্বিক দিক, এমনকি কৌশল পরিবর্তনের বিষয়টিও পর্যালোচনা করে দেখা হয়। তুরাবির সঙ্গে এই তিন কমান্ডারের বৈঠকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে হত্যা করার জন্য এক বড় ধরনের অভিযান চালানোর বিষয়টিও উত্থাপিত হয়। মিসরীয় কমান্ডাররা একমত হন যে মোবারককে হত্যা করার পরিণতিতে যদি মিসরে বড় ধরনের ইসলামী গণঅভ্যুত্থান ঘটে এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও ইসলামী জিহাদী অভিযান জোরদার হয় তাহলে সেটা হবে এক অসাধারণ ঘটনা। কিন্তু সেই হত্যা অভিযান চালানো হবে কিনা সে প্রশ্নে তারা নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে ব্যাপারটা তুরাবির হাতে ছেড়ে দেয়। তুরাবি তখন এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে খাতুর্মে অনুষ্ঠিত পপুলার এ্যারাব এ্যান্ড ইসলামিক কনফারেন্স এর অধিবেশনে প্রসঙ্গটি তোলেন।

সেই বৈঠকে তুরাবি, ওসামা বিন লাদেন ও সুদানি গোয়েন্দা সংস্থার মোস্তফা ইসমাইল ও ওসমানকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। তা ছাড়া হিজবুল্লাহ, ফিলিস্তিনী ইসলামিক জিহাদ, হামাস প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও ঠেকে মতবিনিময় করা হয়। বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা মিসরের বাইরে প্রেসিডেন্ট মোবারককে হত্যার সম্ভাব্য সব দিক নিয়ে আলোচনা করে এই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত প্রদান করেন। তারা বলেন, মোবারককে হত্যার এবং সেই সঙ্গে মিসরে এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। ঐ অভ্যুত্থানে গোটা আন্তার্জাতিক ইসলামী আন্দোলন অংশ নেবে এবং উন্নত ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজাহিদ বাহিনীর দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কায়রো সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে।

### *মোবারক হত্যা চেষ্টার জাল বিস্তৃত হলো*

প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারককে হত্যা এবং মিসরে র‍্যাডিকেল ইসলামীদের অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রাথমিক পরিকল্পনা নেয়া হয় ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে। অভ্যুত্থান ঘটানোর দায়িত্বটির জন্য সিনিয়র কমান্ডার হিসাবে মোস্তফা হামজাকে মনোনী করা হয়। কিন্তু হত্যাকা- ঘটানোর মতো গুরু দায়িত্বে সিনিয়র কমান্ডার হিসাবে কাকে নিয়োগ করা যাবে সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি।তবে গোড়া থেকেই তুরাবি এদায়িত্বে জাওয়াহিরিকে নিয়োগ করার কথা ভাবছিলেন, যদিও জাওয়াহিরি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন। সোমালিয়া যুদ্ধের সময়ই মিসরীয় এই ডাক্তারটির ওপর যথেষ্ট আস্থা গড়ে উঠেছিল তুরাবির। জাওয়াহিরির মতো দক্ষ ও কুশলী অধিনায়ক ইসলামী জিহাদীদের মধ্যে খুব বেশি ছিল না। তাছাড়া জেনেভায় তার সদর দফতরটি এত নিরাপদ ও দুর্ভেদ্য ছিল যে, সেখানে বৈরী কোন শক্তির অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না। গোটা আরব ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে তো বটেই এমনকি ইউরোপ জুড়েও তার ব্যাপক যোগাযোগ ছিল।

১৯৯৫ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে তুরাবি চিকিৎসার নামে সুইজারল্যান্ড যান। সেখান থেকে গোপন সংক্ষিপ্ত সফরে যান জেনেভায়। উদ্দেশ্য জাওয়াহিরির সঙ্গে দেখা করা। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয় জাওয়াহিরিকেই মোবারক হত্যার অভিযানে নেতৃত্ব দিতে হবে। দু'জনেই সিদ্ধান্ত নেন যে, জুনের শেষদিকে আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে আদ্দিস অবাবায় এই হত্যার চেষ্টা চালানো হবে। সিদ্ধান্ত হবার পর জাওয়াহিরি দ্রুত প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেন। ঠিক হয় যে, "ভ্যানগার্ড অব কনকোয়েস্ট আর্গানাইজেশন" এর পতাকাতলে তিনি ঐ অভিযান চালাবেন। মে মাসের শেষ দিনগুলোতে জাওয়াহিরি ফরাসী-সুইস সীমান্তে অবস্থিত "ফার্নি-ভলটেয়ার" নামে একটি ছোট্ট গ্রামে জিহাদী বিশেষজ্ঞদের এক শীর্ষ বৈঠক ডাকেন। জায়গাটা নির্বাচিত করার কারণ হলো বেকায়দায় পড়লে ষড়যন্ত্রকারীরা যেন তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে পারে। বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা দেখলেই অভিযানের বিশালত্ব ও গুরুত্ব বোঝা যেতে পারে। বৈঠকে এসেছিলেন মোস্তফা হামজা-ছদ্মনামে সুদানী পাসপোর্টে। জাওয়াহিরির সহকারী ফুয়াদ তালাত কাশিম তখন ছিলেন কোপেনহেগেনে। তিনি তার অপারেশনস কমান্ডারকে এ বৈঠকে পাঠান। পেশোয়ার থেকে আহমদ শাকি আল ইসলামবুলিও একজন প্রতিনিধি পাঠান। বৈঠকে আদ্দিস আবাবা অভিযানে কি কি মূল কৌশল প্রয়োগ করা হবে এবং কোন কোন সম্পদ নিয়োগ করা হবে তা ঠিক করা হয়। হামজা সময় নষ্ট না করে সুদানে ফিরে গিয়ে মিসরীয় অভ্যুত্থানের জন্য যোদ্ধা নির্বাচন করেন। ওদিকে পেশোয়ার খার্তুমে ইসলামবুলির পরিকল্পনা সেল এক বিস্তারিত ও অত্যাধুনিক অপারেশনাল প্ল্যান তৈরি করেন।

প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর জাওয়াহিরি ১২ থেকে ১৯ জুন পরিদর্শনমূলক সফরে সূদান ও ইথিওপিয়া যান। জাওয়াহিরি ও হামজা আদ্দিস আবাবা অভিযান ও মিসরে ইসলামী অভ্যুত্থান-উভয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে দেখেন। ইথিওপিয়ান ইসলামিক জিহাদ-এ তুরাবির অনুগত ব্যক্তিদের সহায়তায় জাল ট্রাবেল ডকুমেন্ট নিয়ে জাওয়াহিরি সংক্ষিপ্ত গোপন সফরে আদ্দিস আবাবায় গিয়ে হামলার পরিকল্পিত স্থানগুলো স্বচক্ষে দেখে আসেন। এরপর তিনি খার্তুম গিয়ে অপারেশন প্ল্যানটি সবিস্তারে দেখেন। দেখে সন্তুষ্ট হয়ে জাওয়াহিরি অভিযানের জন্য ট্রেনিং গ্রহণরত জিহাদীদের সঙ্গে মিলিত হন। অভিযান ও তার জন্য শাহাদাতবরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন।

অভিযান সফল হবে এমন এক স্থিরবিশ্বাস বুকে নিয়ে জাওয়াহিরি সুইজারল্যান্ডে ফিরে যান। প্ল্যানটা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তিনি তার ঘনিষ্টতম মিসরীয় বন্ধু মোস্তফা হামজা এবং ফুয়াদ তালাত কাশিমকে ২৩ জুন জেনেভায় ডাকেন। এই তিনজন মিলে অভিযান পকিল্পনার বিস্তারিত সকল দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। খারাপ দিক, ভাল দিকগুলো বার বার পরীক্ষা করেন এবং শেষ পর্যন্ত আদ্দিস আবাবায় ও মিসরের দক্ষিণাঞ্চলে তাদের নেটওয়ার্কগুলোকে চূড়ান্ত সবুজ সঙ্কেত প্রদান করেন। ঐ পর্যায়ে পিছু হটার আর কোন পথ ছিল না।অভিযান সফল হওয়ার ব্যাপারে যাতে সামান্যতম ফাঁক না থাকে সেজন্য ইরানী গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা ইতোমধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত অতি তুখোড় যোদ্ধাদের মধ্য থেকে লোক বেছে নেয়া হয়। ১৯৯৫ সালের গ্রীষ্মে তাদের খাতুর্মের উত্তরে আল কুদস বাহিনীর শিবিরে ইরানী বিপ্লবী গার্ডের বিশেষজ্ঞদের হাতে আলাদাভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়। আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, টিমটি গঠন করা হয়েছেল মিসরীয়, সুদানী, আলজিরীয় ও ইথিওপীয় আফগানদের নিয়ে। এমন একটা টিমের ভিতর অনুপ্রবেশ করা কিংবা তাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আঁচ পাওয়া পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে মোটেই সহজ ছিল না। অপারেশনাল প্ল্যানে একজন সুইসাইড বোম্বার এর সম্ভাব্য ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এ জন্য যে মানুষটিকে নির্বাচিত করা হয় সে একজন আরব।

“ভ্যান গার্ডস অব কনকোয়েস্ট” এর পতাকাতলে আফগানিস্তানের একটি সুইসাইড স্কুল থেকে সদ্য পাস করে বেরিয়েছিল। গোড়াতে লোকটি ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দিয়েছিল। সুদানে থাকাকালে ইরানী বিশেষজ্ঞদের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে ফিলিস্তিনী ইসলামী জিহাদের দক্ষ প্রশিক্ষকরা তাকে ট্রেনিং দিচ্ছিল। মোবারক হত্যা চেষ্টার মাত্র এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ করেই তাকে এই অভিযানের সাথে যুক্ত করা হয়। “অপারেশন প্ল্যানটা” তিনটি পৃথক পৃথক দলের সমন্বিত কাজের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। প্রথম দলটির কাজ হবে ভিন্নদিকে দৃষ্টি চালিত করা। ছোট আকারের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যাবহার করে এই দলটি বিমানবন্দর থেকে সম্মেলন কেন্দ্রমুখী সড়কের পাশে অবস্থিত ভবনগুলোর ছাদ থেকে মোবারকের কনভয়ের ওপর আক্রমণ চালাবে। ধরে নেয়া হয়েছিল যে, আক্রান্ত হলে বা গুলিবর্ষণ শুরু হওয়া মাত্র গোটা কনভয়টির চলার গতি মন্থর হয়ে যেতে এমনকি থেমেও যেতে পারে। এমনি বিভ্রান্তিকর বা এলোমেলো অবস্থার সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় দলটি কনভয়ের মাঝামাঝি এগিয়ে যাবে এবং আরপিজি রকেট ছুড়ে প্রেসিডেন্টের গাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে। যদি ওরা প্রেসিডেন্টের গাড়িটিকে আঘাত করতে না পারে সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের কনভয়ের যেকোন গড়িকে আঘাত হানার জন্য ওদের ওপর নির্দেশ থাকবে। প্রথম দুটি দল ব্যর্থ হলে তৃতীয় দলটি এগিয়ে আসবে।

কি করবে সেই দলটি? এই দলটি যা করবে সেটা নির্ধারিত হয়েছে মিসরীয় নিরাপত্তা বাহিনীর। এমনকি মোবারকের দেহরক্ষী দলের মধ্যে ইসলামী জিহাদীদের সোর্সের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সেই সোর্সের কাছ থেকে পরিকল্পনাকারীরা জানতে পেরেছিল একটা গোপন কথা। তা হলো প্রেসিডেন্টের ড্রাইভারের ওপর নির্দেশ ছিল যে, কোন জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিলে সে যেন ঝড়ের বেগে প্রতিবন্ধক ভেঙ্গে পূর্ণগতিতে গাড়ি নিয়ে সামনে ছুটে চলে। এতে যা-ই হয় হোক তার জন্য তাকে ভাবতে হবে না। হত্যা পরিকল্পনাকরীরা ধরে নিয়েছিল যে, ঘটনাস্থল থেকে সবেগে ছুটে বেরিয়ে আসার পর মোবারকের ড্রাইভার নিশ্চয়ই একটু রিল্যাক্স করবে এবং তার জন্য গাড়ির গতি খানিকটা কমিয়েও দেবে। আর এই পর্যায়ে শক্তিশালী বোমাযুক্ত বিশাল গাড়ি চালিয়ে নিয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্টের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগাবে আত্মঘাতি যোদ্ধা (সুইসাইড বোম্বার)। নয়ত অতি কাছাকাছি বিষ্ফোরিত হবে ওটা। ইসলামবুলির বোমা বিশেষজ্ঞরা তাকে আশ্বস্ত করেছিল এই বলে যে, যতই সুরক্ষিত হোক পৃথিবীতে এমন কোন গাড়ি নেই যা এত কাছাকাছি একটা বিষ্ফোরণ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

### *কিভাবে বেঁচে গেলেন মোবারক*

প্রেসিডেন্ট মোবারককে হত্যা করার ব্যাপারে তুরাবি ও মিসরীয় ইসলামী নেতৃবর্গ যে কতটা বদ্ধপরিকর ছিলেন, আগের পর্বে তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অপারেশন প্ল্যান প্রাথমিক অবস্থায় থাকাকালে সেই এপ্রিল মাসের শেষদিকে আদ্দিস আবাবায় একটি ভিলা ভাড়া নেয়া হয়েছিল, যেটি অগ্রবর্তী হেডকোয়ার্টার ও অস্ত্রশস্ত্র রাখার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হবে। অপারেশন প্ল্যান বাস্তবায়নের সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পর আদ্দিস আবাবায় নিযুক্ত বিশেষ দলের সাহায্যকারী নেটওয়ার্কটি পূর্বনির্ধারিত ভিলায় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গোপনে নিয়ে আসতে থাকে। তিন সশস্ত্র দল নিজ নিজ আক্রমণস্থলে যাতে নিরাপদে অবস্থান নিতে পারে এবং অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর যাতে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার ছত্রছায়া পায় সেজন্য নেটওয়ার্কের সুদানী সদস্যরা ইথিওপিয়ার নিরাপত্তা অফিসারদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষায় কত যে সুবিধা পাওয়া গিয়েছিল বলার নয়। আক্রমণে অংশ নেয়া স্কোয়াডটি প্রেসিডেন্ট মোবারকের

আগমনের সময় এবং গমনপথ আগে থেকে একদম সঠিকভাবে জেনে নিতে পেরেছিল। জুনের মাঝামাঝি জাওয়াহিরির সুদান ও ইথিওপিয়া সফরের সময় হত্যা আয়োজনের চূড়ান্ত পর্ব রচিত হয়। ইথিওপীয় ইসলামী জিহাদীদের দিয়ে বাকি অস্ত্র চোরাচালান করে আনা হয় ইথিওপিয়ায়।

অভিযানে যেসব যানবাহন ব্যবহৃত হবে সেগুলো সংগ্রহ করে রাখা হয়। এমনকি গাড়িবোমাও ঠিক রাখা হয়। অভিযানে যারা অংশ নিবে তাদের থাকার জন্য কয়েকটি এ্যাপার্টমেন্ট ও বাড়িও ভাড়া নেয়া হয়। সেখানে খাবারদাবার ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। জাওয়াহিরির সফরের মধ্য দিয়ে এসব প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর সুদানী গোয়েন্দা সংস্থা প্রায় ত্রিশ ইথিওপীয় ইসলামী জিহাদীকে আদ্দিস আবাবা থেকে খার্তুমে সরিয়ে নেয়। আসন্ন অভিযান সম্পর্কে এরা অনেক কিছু জানত। এদের কেউ ধরা পড়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে এটা সুদানীরা চায়নি। অভিযানে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের সবই ছিল সুদানি সেনাবাহিনীর। জুন মাসের মাঝামাঝি তুরাবি আদ্দিস আবাবা অভিযানের তত্ত্বাবধান কাজের দায়িত্বটা সিরাজ মোহাম্মদ হোসেন ওরফে মোহাম্মদ সিরাজ নামে এক সিনিয়র সুদানী গোয়েন্দা অফিসারকে প্রদান করেন। তিনি আদ্দিস আবাবায় গিয়ে অভিযান বাস্তবায়নের অপারেশনাল কমান্ড নেন।

এই সিরাজ ১৯৯৩ সালে নিউইয়র্কে সুদানী কানসাল হিসাবে ছদ্মনামে কাজ করার সময় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিষ্ফোরণে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২০ জুনের দিকে সিরাজ আগাম প্রস্তুতির গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব বিষয়ে সন্তুষ্ট হবার পর অভিযানে অংশগ্রহণকারী আসতে শুরু করে দেয়। তারা তাদের অস্ত্রপাতি, সড়ক প্রতিবন্ধকতাকারী ট্রাক ও কারবোমা বা গাড়িবোমা ইত্যাদি আঘাত হানার প্রাক্কালে সুদানী গোয়েন্দা সংস্থার আলাদা একটা নেটওয়ার্কের কাছ থেকে পান। নেটওয়ার্কটি চালাতেন শেখ দারবিশ নামে এক সুদানী নাগরিক, যিনি তুরাবির অতি অনুগত ও বিশ্বস্ত। দারবিশ ওদের দুটো বড় সুটকেস বোঝাই ছোট আগ্নেয়াস্ত্র, আরপিজি লঞ্চার, শেল, গুলিগোলা ও বিস্ফোরক দ্রব্য দেন। প্রথম দলটি তাদের শরীরে অস্ত্রসস্ত্র বহন করবে। দ্বিতীয় দলটি সঙ্গে ট্রাবেল ব্যাগ এনেছিল রকেট ও লঞ্চার বহনের জন্য। কথাছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রয়োজন না হলে সেগুলো ব্যাগ থেকে বের করা হবে না। এই সিদ্ধান্তটাই মারাত্মক ভুল বলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়।

আক্রমণের দিনটি ১৯৯৫ সালের ২৬ জুন যথারীতি ঠিকমতোই শুরু হয়। ইথিওপীয় গোয়েন্দা অফিসাররা হোসনী মোবারকের পরিকল্পিত সিডিউল সম্পর্কে শেষ মুহূর্তের তথ্য সর্বক্ষণ সিরাজকে সরবরাহ করে চলেছিল। তার ভিত্তিতে তিনি যথাসময়ে লোক মোতায়েন শুরু করেন। হত্যা প্রচেষ্টার গোটা অধ্যায় জুড়ে মোবারকের আগমনের সময় ও গমনপথ সম্পর্কে গোয়েন্দা বাহিনীর দেয়া তথ্য অতিমাত্রায় সঠিক ছিলো। তার মানে সিরাজের ইথিওপীয় সোর্সগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট মোবারকের সফরসঙ্গীদের আগমনে বিলম্ব এবং তা থেকে উদ্ভুত বিভ্রান্তির ফলে গোটা অভিযানটি প- হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট মোবারকের বিমান বন্দরে এসে পৌঁছার কথা ছিল সকাল সাড়ে আটটার ঠিক আগে এবং আসার পরপরই আধ মাইলের কিছু বেশি দূরে সম্মেলন কেন্দ্র অভিমুখে রওনা দেয়ার কথা ছিল। পরিকল্পনামতো সোয়া আটটার পর পরই ঐ রুটে ইথিওপীয় ও মিসরীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। মোবারকের প্লেন ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু সফরসঙ্গীরা সময়মতো না আসায় তার কনভয়টিকে গুছিয়ে তোলা যাচ্ছিল না। মোবারকের কনভয় তৈরি হতে বিলম্ব

হচ্ছিল বলে ইথিওপীয় পুলিশরাও বিরক্ত হয়ে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। ওদিকে দ্বিতীয় ঘাতক দলটি যে জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল তাদের ওপর যাতে সন্দেহের দৃষ্টি না পড়ে সেজন্য তারা রকেট ও রকেট লঞ্চার ট্রাভেল ব্যাগের ভিতর রেখে তাদের ফায়ারিং পজিশন থেকে সামান্য দূরে সরে যায়।

প্রেসিডেন্ট মোবারক ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। আটটা পঞ্চান্ন মিনিটের দিকে কনভয়ে যেকজন লোক আছে তাদের নিয়েই তিনি অবিলম্বে সম্মেলন কেন্দ্র অভিমুখে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন। মোবারকের কনভয় যখন ছুটে চলছে সে সময় জিহদী দলের প্রথম অংশটি পূর্বপরিকল্পনা মতো ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি ছোড়ে। কিন্তু নীল রঙের যে টয়োটা ট্রাকটির তখন উল্টো দিক থেকে এসে কনভয়ের সামনে পথরোধ করে দাঁড়ানোর কথা ছিল সেটি যথেষ্ট দ্রুত আসতে পারেনি ওদিকে নিরাপত্তার কারণে জিহাদীদের দ্বিতীয় দলটি যেহেতু তাদের রকেট ও লঞ্চার ইত্যাদি ট্রাভেল ব্যাগের ভিতর রেখে দিয়েছিল, এতো অল্প সময়ের ভিতর তারা ওগুলো ব্যাগ খুলে বের করে ছুঁড়ে মারতে পারেনি। তৃতীয় দলটির সদস্য ছিল একজন। সে ছিল বোমাসজ্জিত গাড়িটির চালক বা সুইসাইড বোমবার। গাড়িটিসহ চালকের যেখানে থাকবার কথা সেখানেই সে ছিল। কিন্তু নীল রঙের টয়োটা ট্রাকটির সামান্য বিলম্বই সব গোলমাল করে দিল। প্রথম দলটির কনভয়ের মূল-লিমুজিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। ইথিওপীয়া সরকারের ঐ লিমুজিনেই মোবারকের থাকার কথা ছিল। কিন্তু মোবারক আসলে একটি বিশেষ মার্সিডিজ গাড়িতে ছিলেন।

এই গাড়িটি তিনি কায়রো থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এনেছিলেন। ওটা শুধু বুলেট প্রুফই ছিল না, আরপিজি রকেটের আঘাত সইবার মতো শক্ত-সমর্থও ছিল। যাই হোক, প্রথম দলটি যখন ভুল গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে চলেছে সে সময় এলো নীল টয়োটা ট্রাক। সামান্য বিলম্বের জন্য ট্রাকটা মোবারকের কনভয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকাতে পারেনি। না আটকাতে পেরে ট্রাকের ড্রাইভার এবার সজোরে ধাক্কা লাগানোর চেষ্টা করে লিমুজিনের গায়ে। ধাক্কার হাত থেকে বাঁচবার জন্য গাড়িগুলো যেটা যেদিকে পারল ছুটতে চেষ্টা করল। ওদিকে প্রথম দলটির ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি বৃষ্টির মতো বর্ষিত হয়ে চলেছে। চারদিকে একটা বিশৃঙ্খল, এলোমেলো অবস্থা। মোবারকের ড্রাইভার বুঝল এমনি এলোমেলো অবস্থার ভিতর দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না। তাই সিকিউরিটি প্ল্যান থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে সে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে নিল মোবারকের মার্সিডিজ গাড়ি। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাল বিমানবন্দরের দিকে। এই ভাবে ড্রাইভারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে রক্ষা পেল মোবারকের জীবন। উল্টোদিকে না ছুটে সামনে এগোলে সম্ভবত বাঁচানো যেত না তাকে। কারণ এ্যামবুশস্থল থেকে আর তিন শ'ফুট দূরেই অপেক্ষা করছিল সুইসাইড বোম্বার- গাড়িবোমা নিয়ে অত্মদানে প্রস্তুত এক মুজাহিদ যোদ্ধা। প্রেসিডেন্ট মোবারকের প্রাণনাশের চেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর অনিবার্য যা ঘটবার কথা অনুমান করে সিরাজ ও তার দলের লোকেরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে ইথিওপীয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। নিরাপদে খার্তুমে গিয়ে পৌঁছে। মোবারককে যদি হত্যা করা যেতো তাহলে ঐদিনই জিহাদ ও সশস্ত্র যুদ্ধের কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় শুরু করা যেতো মিসরে। মোস্তফা হামজা ঠিক করে রেখেছিলেন যে মোবারক নিহত হবার সবুজ সঙ্কেত পেলেই তিনি মুজাহিদ বাহিনী মিসরে পাঠিয়ে দেবেন।

এরা মিসরে অনুপ্রবেশ করে নানান রুট ধরে বিভিন্ন শহর-নগরে পৌঁছে স্থানীয় জিহাদী নেটওয়ার্কের সাথে মিলিত হবার পর জিহাদ ও সশস্ত্র সংগ্রামের নজিরবিহীন জোয়ার সৃষ্টি করবে। কিন্তু হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার খবর খার্তুমে পৌঁছলে তুরাবি ও

হামজা গোটা অভিযান প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। ইসলামপন্থীদের কমান্ড সেন্টার গোটা মিসরে তাদের বিশাল নেটওয়ার্ককে এ্যালার্ট করে দেয়। ফলে মিসরীয় নিরাপত্তা বাহিনীর ধরপাকড় অভিযান শুরু হবার আগেই জিহাদীদের সবাই গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। মিসরের ইসলামী জিহাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে কায়েকদিন সময় নেয়। শেষে ৪ জুলাই মোবারক হত্যা চেষ্টার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে শেখ ওমর আব্দুর রহমানের সংগঠন আল-জামাহ আল ইসলামিয়া একটি ইশতেহার প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় যে ১৯৯৪ সালে মিসরীয় পুলিশের হাতে নিহত এক মুজাহিদ কমান্ডারের হত্যার বদলা নিতে তালাত ইয়াসিন কমান্ডো এই অভিযান চালিয়েছে। মিসরীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টি প্রকৃত লোকজনের ওপর যাতে না এসে পড়ে সেজন্যই যে এমন বক্তব্য দেয়া হয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

### *সৌদি আরবে আঘাত হানা শুরু*

১৯৯৫ সালের ১৩ নভেম্বর। বেলা ১১টা বেজে ৪০ মিনিট। রিয়াদের মিলিটারি কো-অপারেশন প্রোগ্রাম ভবনের স্ন্যাকবারে লাঞ্চ করতে বসেছে কয়েক ডজন আমেরিকান। ভবনটা একটা সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সৌদি ন্যাশনাল গার্ড-এর সদস্যদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালিয়ে থাকে আমেরিকানরা। তিন তলা ভবনের সামনের দিকে পার্কিং লট। বেশ কয়েকটা গাড়ি আছে সে জায়গায়। ঘড়ির কাঁটা ১১টা ৪০ মিনিটে স্পর্শ করতেই গগণবিদারী এক শব্দে প্রকম্পিত হলো চারদিক। পার্কিং লটে বিস্ফোরিত হয়েছে একটি গাড়ি বোমা। প্রচন- সে বিস্ফোরণে ভবনের একটা দিক উড়ে গেল। ৪৫ টিরও বেশী গাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। এক মাইল দূরের বাড়ির জানালার কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙ্গে গেল। কয়েক মিনিট পর আরো একটি বিস্ফোরণ। সেই একই পার্কিং লটে। তবে এবারেরটা এ্যন্টি পার্সোনেল বোম্ব। প্রাণঘাতী বোমা। প্রথম বিস্ফোরণের পর আহতদের উদ্ধারে যারা ছুটে গিয়েছিল তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হতাহত হলো দ্বিতীয় বিস্ফোরণে। রিয়াদের কেন্দ্রস্থলে গাড়িবোমা বিস্ফোরণের এই ঘটনাটা নিছক চমক লাগানো জিহাদী হামলা ছিল না। ছিল তার চেয়েও বেশি কিছু। প্রমাণ হলো যে, সৌদি আরবের অভ্যন্তরে এক ব্যাপকভিত্তিক ও শক্তিশালী ইসলামী জিহাদীদের অন্তর্ঘাতমূলক অবকাঠামোর অস্তিত্ব আছে। জানতে পারা গেল যে, সেই মুজাহিদ বাহিনী তেহরান ও খার্তুমের দ্বারা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এরা মূলত সৌদি আফগান এবং সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকজন নিয়ে গঠিত, যারা দুর্নীতিবাজ আল- সৌদ রাজপরিবারের ওপর বীতশ্রদ্ধ। এরা রাজপরিবারের পতন ঘটানোর জন্য জিহাদ ত্বরান্বিত করতে বদ্ধপরিকর।

১৩ নভেম্বর রিয়াদের বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত হয়, যার মধ্যে পাঁচজনই আমেরিকান। আহত হয় ৬০ জনেরও বেশি, যার অর্ধেক হলো আমেরিকান। এদের কয়েকজনের অবস্থা ছিল বেশি গুরুতর। আসলে বোমাটা পেতে রাখা হয়েছিল একটা সাদা রঙের ভ্যানগাড়িতে। ২শ’ থেকে সোয়া দু’শ’ পাউন্ডের অতি উচ্চশক্তির বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি ছিল বোমাটা। খুব সম্ভবত চেকোস্লোভাকিয়ার তৈরি কার্যকর প্লাস্টিকের বিস্ফোরক সেমটেক্স ছিল বোমার উপাদান। “মিৎসুবিসি ৮১” ভ্যানটি থেকে সূত্র খুঁজে পাওয়ার মতো সবকিছু মুছে ফেলা হয়েছিল। সব রকম সিরিয়াল নম্বর, এমনকি চেসিসের গা থেকেও সব নম্বর সম্পূর্ণ ঘষে তুলে ফেলা হয়েছিল। অত্যাধুনিক টাইমিং ডিভাইস দিয়ে বোমাটি ফাটানো হয়। সম্ভবত এর সঙ্গে রিমোট কন্ট্রোল ব্যবস্থাও যুক্ত ছিল। এন্টি-পার্সোনেল বোমাটিও অত্যন্ত নিপুণ ও দক্ষ হাতে বানানো ছিল। তাছাড়া এটি বসানো এবং টাইমিং করার ব্যাপারেও মুনশিয়ানার ছাপ ছিল। বোমাটি আকারে ছোট হলেও এটি তৈরির কাজে এমন সব উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সম্ভাব্য সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে হতাহত করা যায়। বিস্ফোরণটা যে সময় ঘটানো হয়েছে তা থেকে প্রমাণ

হয় যে, এর টার্গেট ছিল আমেরিকানরা। সাধারণত এ সময়ই আমেরিকানরা ভবনের সামনের অংশে স্ন্যাকবারে লাঞ্চ করতে বসত এবং সৌদি ও অন্য মুসলমানরা জোহরের নামাজ পড়ার জন্য যেত নিকটবর্তী মসজিদে। যে সময়টা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল তা থেকে আরও একটা ব্যাপার বুঝা গেছে। তা হলো বোমা ব্যবহারকারী বা ব্যবহারকারীরা ভবনটির ভিতর-বাইরের অনেক কিছুই জানত এবং জায়গাটা দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

অভিযানে দু'টো বোমার ব্যবহার থেকে আরও একটা জিনিস বেরিয়ে আসে। গোটা অভিযানের প্রস্তুতির ব্যাপার একধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির হাত ছিল। সৌদি সূত্রের এক সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছিল যে, বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনাটি যে মহলেরই হোক না কেন এর টার্গেট নির্বাচনে অতিমাত্রায় সতর্কতা বা সাবধানতার পরিচয় দেয়া হয়েছে। তেমনি পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও প্রদর্শন করা হয়েছে অসাধারণ পেশাদারিত্ব মনোভাবের। বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমেরিকান সামরিক বিশেষজ্ঞদের মেরে ফেলা হয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা বা বড় ঘটনা নয়। বড় কথা হলো, বিস্ফোরণের পিছনে যারা রয়েছে তারা বোমা বিস্ফোরণের উন্নত প্রযুক্তি করায়ত্ত করেছে। এবং লক্ষ্য স্থলে পৌঁছার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে গোপনে অনুপ্রবেশ করার সব রকম কলাকৌশল প্রয়োগ করেছে। তাছাড়া বিস্ফোরণের নেপথ্য নায়কদের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধিও অতিশয় প্রখর। রিয়াদ নগরীর কেন্দ্রস্থলে তাদের টার্গেট হিসাবে আমেরিকানদের বেছে নেয়ার উদ্দশ্য ছিল গোটা বিশ্বের প্রচার মাধ্যমের সর্বাধিক দৃষ্টি কেড়ে নেয়া এবং এক দারুণ রাজনৈতিক হৈ চৈ ফেলে দেয়া। আসলে বিন লাদেনসহ আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদী নেতৃবৃন্দ শুধু সৌদি আরবে নয় বরং ঐ অঞ্চলে জিহাদের দ্রুত বিস্তার চাইছিলেন। তাদের সেই পরিকল্পনার অংশ ছিল রিয়াদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি।

১৯৯৫ সালের হেমন্তেই গোটা অঞ্চলে ইসলামী জিহাদী তৎপরতার বিস্তার ঘটতে শুরু করেছিল। অক্টোবরের শেষদিকে সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে মিসরে। বিশেষ করে সেখানে থানায়, ট্রেনে, ট্যুরিস্ট বাসে নতুন করে হামলা শুরু হয়। কায়রো উত্তরোত্তর শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ইসলামী জিহাদী শক্তির মোকাবেলায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে মিসর ইসলামী অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় ইরান ও সুদানের স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, তারা আরব উপদ্বীপের রক্ষণশীল সরকারগুলোর পতন ঘটাতে পারবে। আর এই পতন ঘটানোর একটা মাত্র উপায় হলো কায়রোকে অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখা যাতে সে এসব রক্ষণশীল সরকারগুলোর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে না পারে। ১৯৯৫ এর নভেম্বর ইরান-সুদানসহ আন্তর্জাতিক ইসলামী নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, তাদের সেই মহাপকিল্পনার সৌদি অংশটা বাস্তবায়িত করার সময় এসে গেছে। ১৩ নভেম্বর রিয়াদের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ছিল তারই প্রথম মহড়া।জিহাদী ও সশস্ত্র কার্যকলাপে কোমর বেঁধে নামবার জন্য সৌদি ইসলামী শক্তিসমূহকে নভেম্বরের গোড়াতেই সবুজ সঙ্কেত দেয়া হয়েছিল। রিয়াদ এলাকার ইসলামী নেটওয়ার্কে ছিল সুদক্ষ জিহাদীদের একটা ছোট গ্রুপ। যার বেশির ভাগই ছিল সৌদি আফগান এবং এদের স্থানীয় সমর্থকবৃন্দ। রিয়াদের সেই অভিযানের প্রাক্কালে ইউরোপ ও এশিয়া থেকে আলাদা আলাদাভাবে আরও কিছু দক্ষ জিহাদীকে এনে স্থানীয় নেটওয়ার্কটির শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। এদের সবাই ছিল সৌদি নাগরিক।

১৩ নভেম্বারের অভিযানে যারা অংশ নিয়েছিল ও যারা সাহায্য করেছিল তারাও ছিল সৌদি নাগরিক। এদের অনেকেই ছিল রাজতন্ত্রের ওপর বীতশ্রদ্ধ, বিক্ষুব্ধ একশ্রেণীর তরুণ সৌদি, যারা আফগানিস্তানে ট্রেনিং পেয়েছিল। সে সময় র‍্যাডিকেল

ইসলামপন্থীদের বিরোধী সৌদি সূত্রে বলা হয় যে, সিআইএ ও আইএসআই এর হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সুদক্ষ সৌদি বোমা প্রস্তুতকারকরা এখন মধ্যপ্রাচ্য ও বসনিয়ায় জিহাদী নেটওয়ার্ককে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রদান করছে এবং সেই নেটওয়ার্কেরই একটা অংশ রিয়দে বোমা ফাটিয়েছে। বিস্ফোণের প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই হয়েছিল। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে কারোর অসুবিধা হয়নি। উপসাগরীয় দেশগুলোর পত্রপত্রিকায়ও তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। বলা হয়েছিল, এটা সৌদি আরব তথা গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার অপপ্রয়াস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়িফ বিন আব্দুল আজিজও ঘরোয়াভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, এই বিস্ফোরণ এক 'বিপজ্জনক মহামারী'র অংশ। কিন্তু সৌদি সরকার দেখাতে চাইল যে, বিস্ফোরণের লক্ষ্য তৃতীয় পক্ষ তথা আমেরিকানরা; সৌদি রাজতন্ত্র নয়। আর এভাবেই সরকার সৌদি আরবের মাটিতে ইসলামী জিহাদের মূল কারণগুলোর মোকাবালা করতে রাজি হলো না। প্রতিরক্ষা দফতর ও প্রিন্স সুলতানের মুখপাত্র বলে পরিচিত 'আল হায়াহ' পত্রিকায় সেই মনোভাব ব্যক্ত করে পরিষ্কার বলা হলো যে, এই বিস্ফোরণ বিদেশীদের কাজ। এর সঙ্গে সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ কোন শক্তির সংস্রব নেই।

### *সৌদি আরবে জিহাদ বিস্তার-১*

রিয়াদে জিহাদী হামলার ঘটনার অনুপযোগী বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞ মহলের আর কোন সন্দেহ থাকেনি যে আল- সৌদ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদীদের জিহাদ শুরুর ব্যাপারে এতদিন যা ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল এখন তার বাস্তব প্রয়োগ শুরু হলো মাত্র। এ ক্ষেত্রে টার্গেট নির্বাচনই হলো তার প্রমাণ। আঘাত হানা হলো একটি মার্কিন সামরিক স্থাপনায়, যেখানে চরম ঘৃণিত রয়াল গার্ডকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। এতোদিনের ঘোষিত হুঁশিয়ারি আর টার্গেট নির্বাচনের মধ্যে এমন সমন্বয় ছিল যে সাধারণ মানুষেরও বুঝতে অসুবিধা হয়নি এটা ইসলামী জিহাদীদের কাজ। এর জন্য কোন ঘোষণা দিতে বা লিফলেট ছাড়তে হয়নি। ইসলামী জিহাদীরা ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসেই সৌদি রাজশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল। ১০ এপ্রিল ইসলামিক চেঞ্জ মুভমেন্টের নামে দেয়া এক ইশতিহারে গোটা আরব উপদ্বীপে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী এবং সেই সঙ্গে অল-সৌদ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে আসন্ন সশস্ত্র হামলার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি করে দেয়া হয়েছিল।

ইশতেহারে পাশ্চাত্য বাহিনীকে ১৯৯৫ সালের ২৮ জুনের মধ্যে আরব উপদ্বীপ ত্যাগের শেষ সময় বেঁধে দিয়ে বলা হয়েছিল, অন্যথায় ঐ তারিখ থেকে তাদের ওপর আঘাত হানা হবে। ওতে অভিযোগ করা হয় যে, সৌদি রাজপরিবার ইসলামকে ক্রুসেডের শক্তির সেবায় নিয়োজিত করেছে। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় হলো এই যে, এই ইশতেহারে ব্যবহৃত অনেক শব্দই পরবর্তীকালে বিন লাদেনকে তার বিভিন্ন ডিক্রী ও ফতোয়ায় ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তাছাড়া রিয়াদে বোমা বিস্ফোরণের স্টাইল এবং তাতে ব্যবহৃত উচ্চ শক্তির বিস্ফোরক ও ফিউজের প্রকৃতি দেখে বোঝা যায় যে, পাকিস্তান ও সুদানে ইসলামী জিহাদী প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে ঠিক এ ধরনের অত্যাধুনিক বোমা তৈরি, সেগুলো কোথায় কিভাবে বসাতে হয় এবং কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটাতে হয় সেই কৌশলগুলো শিখানো হয়েছিল। এসব শিবিরে ট্রেনিং নিয়েই বিন লাদেনের সৌদি অনুসারীরা ১৯৯৫ এর গ্রীষ্মে একের পর এক চমক লাগানো অভিযান চালাতে শুরু করে। তার আগে হাসান আল তুরাবির সুপারিশক্রমে বিন লাদেন ও সৌদি র‍্যাডিকেল ইসলামী নেতৃত্ব আল-সৌদ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে সশস্ত্র জিহাদে রূপান্তরিত করে। এ কাজে সাহায্যের জন্য ইরানী গোয়েন্দা সংস্থা গোটা সৌদি আরবে সম্ভাব্য টার্গেট হিসাবে বেশ কিছু মার্কিন স্থাপনার ওপর নজরদারির এক দুঃসাহসিক কার্যক্রম নেয়। এই কার্যক্রম দেড় থেকে দু'বছর ধরে চলেছিল।

রিয়াদের মিলিটারি কো-অপারেশন প্রোগ্রাম ভবন এবং খোবার টাওয়ার্সও (১৯৯৬ এর গ্রীষ্মে হামলা হয়) ছিল এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

১৩ নভেম্বর রিয়াদের মিলিটারি কো-অপারেশন প্রোগ্রাম ভবনে বোমা অভিযানের প্রস্তুতি ছিল সর্বাত্মক। তাও এই প্রস্তুতির কিছু কিছু খবর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। পদস্থ সৌদি কর্মকর্তারা পরে স্বীকার করেন যে বিস্ফোরণের প্রায় এক সপ্তাহ আগে রিযাদ কর্তৃপক্ষকে আসন্ন জিহাদী হমালা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিল। বিস্ফোরণের এক সপ্তাহ আগে ইসলামীক চেঞ্জ মুভমেন্ট রিয়াদে মার্কিন ও ব্রিটিশ দূতাবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে হুঁশিয়ারিসূচক ফ্যাক্সবার্তা পাঠায়। সৌদি ও পাশ্চাত্যে নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ অবশ্য এসব হুঁশিয়ারিকে তেমন আমলে দেয়নি। সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীকেও মোটেই এ্যালার্ট রাখা হয়নি। তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা, রিয়াদের গভর্নর প্রিন্স সালমান বিন আব্দুল আজিজ জেনেশুনেই এই জিহাদী অভিযানটি ঘটতে দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ফায়দা লুটার জন্যই। প্রিন্স সালমান বাদশাহ ফাহাদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। ইসলামী জিহাদ দমন করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য দুটোই তাঁর আছে এমন একটা সুনাম তাঁর ছিল। অন্যদিকে ইসলামী জিহাদীদের ক্রমবর্ধমান হুমকিতে গোটা আল-সৌদ রাজপরিবার ছিল আতঙ্কিত। কুশলী প্রিন্স সালমান এই দুটো বিষয়কে তাঁর ক্ষমতায় যাওয়ার এবং সকলের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের টিকিট হিসাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা এঁটেছিলেন। শোনা যায় ১৯৯৪ সালের শুরুতে প্রিন্স সালামান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিষয়টি দেখাশোনার জন্য বাদাশাহ ফাহাদের ব্যক্তিগত ম্যান্ডেট লাভ করেছিলেন।

### *সৌদি আরবে জিহাদ বিস্তার-২*

১৯৯৫ সালের শরতে ইসলামী জিহাদীদের সঙ্গে প্রিন্স সালমানের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। লন্ডনভিত্তিক সৌদি ইসলামী সংগঠন কমিটি ফর দ্য ডিফেন্স অব লেজিটিমেট রাইটস এর মোহাম্মদ আল মাসারি প্রিন্স সালমান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ইনি আল-সৌদ পরিবারের অন্য সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও খোলামনা। কিন্তু তাঁর মতো ভন্ড আর দ্বিতীয়টি নেই। ইসলামী জিহাদীদের সঙ্গে তার মাখামাখির ব্যাপারটা লোকদেখানো মাত্র। তার প্রকৃত লক্ষ্য ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতায় টিকে থাকা। সৌদিদের অনেকের মধ্যে এমন গুজবও ছড়িয়েছিল যে প্রিন্স সালমান ইচ্ছা করেই ঐ বিস্ফোরণ ঘটতে দিয়েছিলেন যাতে রাজপরিবারের ওপর মহলে ইসলামী জিহাদের ভীতি বৃদ্ধি পায় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদ দমনের জন্য তারা তাকে ক্ষমতায় বসায়। তবে আল-সৌদ রাজপরিবারের শীর্ষস্থানীয় একটি মহল ১৩ নভেম্বরের বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার প্রকৃত তদন্ত ধামাচাপা দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কারণ সত্যিকারের তদন্ত হলে সৌদি গোয়েন্দা বাহিনীর এক বড় ধরনের ব্যর্থতাই প্রকাশ হয়ে পড়ত। সেই ব্যর্থতার প্রধান বিষয় ছিল একটা গোপন চুক্তি। সৌদি-পাকিস্তান সেই চুক্তির আয়োজক ছিলেন সৌদি গোয়েন্দা প্রধান প্রিন্স তুর্কি আল ফয়সাল।

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসের সেই চুক্তিতে ঠিক হয় যে, আইএসআই পাকিস্তান-আফগানিস্তানে ট্রেনিং ও আশ্রয় নেয়া সৌদি জিহাদীদের রাস টেনে ধরবে। বিনিময়ে সৌদি আরব পাকিস্তানকে বিপুল অঙ্কের সাহায্য দেবে এবং ওয়াশিংটনের কাছে পাকিস্তানের হয়ে ওকালতি করবে। বাস্তবে যা ঘটেছে, রিয়াদের উপলব্ধি অনুযায়ী তা হলো- আইএসআই ঠিকই সৌদি অর্থ নিয়েছে আবার একই সঙ্গে সৌদি জিহাদীরা পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সুদান ও ইরানে ট্রেনিং ও অন্যান্য সাহায্যও লাভ

করেছে।১৩ নভেম্বরের বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে ওসামা বিন লাদেন ও সৌদি র‍্যাডিকেল ইসলামীরা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রগুলো সৌদি আরবে যে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করে সেখান থেকে তাদের আর পিছু হটার উপায় ছিল না। ঘটনাটা রাজপরিবারের ক্ষমতার দ্বার পথে যতই কম্পন সৃষ্টি করুক এতে সমাজের বাকি জনগোষ্ঠীর কাছে সৌদি র‍্যাডিকেল ইসলামীদের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। রিয়াদের ঐ বিস্ফোরণের অল্পদিন পরই সৌদি আরবের অভ্যন্তরে জিহাদী অভিযান বিস্তারের খবর পাওয়া যায়।

২০ থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে কমপক্ষে দু'টো বড় ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক অভিযানের চেষ্টা অল্পের জন্য সফল হতে পারেনি। প্রতিরক্ষা দফতর ভবনের সামনে একটি গাড়িবোমা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। আরেকটি গাড়ি বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয় পেট্রোমিন অয়েল কোম্পানির পার্কিং লটে। বোমা দু'টো ১৩ নভেম্বর বিস্ফোরিত বোমার অনুরূপ হলেও অভিন্ন ছিল না। তা থেকে বোঝা যায় যে রিয়াদে অতি উন্নত ট্রেনিং পাওয়া বোমা প্রস্তুতকারক একজন ছিল না, ছিল একাধিক এবং এরা সবাই একই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে ছিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাশ্চাত্যের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আসন্ন হামলা সম্পর্কে আবার হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দূতাবাস এবার ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়। ওদিকে তেহরান ও খার্তুমের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতার ফলে সৌদি ইসলামী শক্তিসমূহ আকারে ও ক্ষমতায় ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে এবং দেশজুড়ে বাড়তে থাকে জিহাদী হামলার আশঙ্কা।

### *রিয়াদ থেকে এবার ইসলামাবাদ*

রিয়াদে ১৩ নভেম্বরের বোমা বিস্ফোরণের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই মিসরীয় "আফগান" বা ইসলামী জিহাদীরা জানান দিয়ে দিল যে তারাও কিছুমাত্র কম যায় না। দিনটা ১৯৯৫ সালের ১৯ নভেম্বর। সকাল ৯টা বেজে ৫০ মিনিট। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে মিসরীয় দূতাবাসের গেট সজোরে ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করল দ্রুতগতির একটি ছোট্ট গাড়ি। এর পরপরই ঘটল ছোটখাটো এক বিস্ফোরণ। সামনের রিসেপশন এলাকা যেখানে ভিসা সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজের জন্য লোকজন জড়ো হয়েছিল সেখানেই ঘটল বিস্ফোরণটি। ঐ ছোট গাড়ি থেকে ছুড়ে দেয়া একটা হ্যান্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ছিল ওটা। দূতাবাস প্রাঙ্গণে ভয়ার্ত লোকজন যখন ছোটাছুটি করছে সেই গোলমেলে অবস্থার সুযোগে এবার ভাঙ্গা গেট দিয়ে ভিতরে ছুটে এলো নীল রঙের একটা ডাবল কেবিন মাজদা পিকআপ ভ্যান। এসেই প্রচন্ড গতিতে ছুটে মূল ভবনের সামনের অংশে সজোরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটল আরেকটা বিস্ফোরণ। তবে এবারের বিস্ফোরণের ভয়াবহাতা বা প্রচন্ডটা ছিল এমন যে মুহূর্তের মধ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণে সৃষ্টি হলো ২০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট গভীর একটা গর্ত।

মারা গেল ভ্যানের ড্রাইভারসহ ১৯ জন। আহতের সংখ্যা ষাটের অধিক। দু'টো বিস্ফোরণ ছিল এক ও অভিন্ন পরিকল্পনার অংশ। প্রথমে ছোট বিস্ফোরণটা পরবর্তী মূল বিস্ফোরণের পথ প্রসস্ত করার জন্য ঘটানো হয়েছিল যাতে সকলের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয় গাড়িটি অর্থাৎ মাজদা পিকআপ ভ্যানটিতে যে উচ্চশক্তির বিস্ফোরক ছিল সম্ভবত তা হবে ন'শ' পাউন্ড ওজনের। দু'টো আক্রমণই সুইসাইড বোম্বার, মানে আত্মোৎসর্গী যোদ্ধার দ্বারা পরিচালিত হয়। বিস্ফোরণের অল্পক্ষণ পরেই মিসরের প্রধান তিনটি ইসলামী সংগঠন আল-জামাহ আল ইসলামিয়া, আল-জিহাদ আল-ইসলামী এবং ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস গ্রুপ ঘটনার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে। একাধিক সংগঠনের এমন দাবি করার উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ছিল বিভ্রান্তির ধূম্রজাল

সৃষ্টি করে শত্রুপক্ষকে বোকা বানানো। তবে উল্লিখিত তিনটি সংগঠনই ছিল আর্মড ইসলামিক মুভমেন্ট (অওগ) এর অঙ্গ সংগঠন। শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে ইসলামিক জিহাদ এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং সংগঠনের দুই সদস্য ইসাম আল কামারি ও ইব্রাহিম সালামাহ এতে আত্মদান করেছে।

মোবারক হত্যা চক্রান্তের মতো ইসলামাবাদের বোমা বিস্ফোরণ অভিযানটিও কড়া নিয়ন্ত্রণ ও গোপনিয়তার মধ্যে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়। জেনেভা থেকে আইমান- আল-জাওয়াহিরি এবং লন্ডন থেকে তার সেকেন্ড ইন কমান্ড ইয়াসির তৌফিক সিড়ি একাজের তত্ত্বাবধান ও অর্থসংস্থান করেছিলেন। ঘটনার চারদিন আগে ১৫ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডে নিযুক্ত মিসরের দু’নম্বর কূটনীতিক আলা আলদীন নাজমীকে তারা গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করে। নাজমী কূটনীতিকের পোশাকে আসলে ছিলেন গোয়েন্দা অফিসার এবং তিনি জেনেভায় জাওয়াহিরির গোপন আশ্রয়স্থলের সন্ধান করছিলেন। মিসরীয় দূতাবাসে বিস্ফোরণের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ছিল মোবারক সরকারের বিরুদ্ধে মিসরের ইসলামী জিহাদীদের দ্রুত প্রসারমাণ সংগ্রামের অংশ। কিন্তু তার জন্য স্থান হিসাবে ইসলামাবাদকে বেছে নেয়া হয়েছিল কেন? এটা ঠিক যে মিসরীয় ইসলামী জিহাদীদের পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পেশোয়ারে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ও প্রশিক্ষণ ঘাঁটি ছিল। তাছাড়া বেশ কিছু সিনিয়র মিসরীয় জিহাদী কাশ্মীরী মুজাহিদদের শিবিরে এবং হরকত-উল-আনসারের মতো আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনসমূহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছিল।

সুতরাং এসব ঘাঁটি বা প্রতিষ্ঠানের যে কোন একটা থেকে ইসলামাবাদে মিসরীয় দূতাবাসে অভিযান চালানো অনেক সহজ ও সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে এই ইসলামী জিহাদীরা পাকিস্তানে ছিল অতিথি। সেখানে তাদের আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছিল পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। সুতরাং যারা তাদের আতিথ্য দিয়েছে, সাহায্য সহায়তা দিয়েছে তাদেরই রাজধানীর বুকে এরকম আঘাত হানা অত্যন্ত অর্থহীন ও দৃষ্টিকটূ লাগার কথা। তাছাড়া অন্যান্য দেশের ইসলামী সংগঠনের মতো মিসরীয় সংগঠনের শিবির ও স্থাপনাগুলোও ছিল আইএসআই এর কড়া নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে। কাজেই আইএসআই’ এর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তদুপরি আইএসআই এর সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে সিনিয়র মিসরীয় মুজাহিদ কমান্ডারদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একটা বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য তারা সেই সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলার ঝুঁকি নেবে এটা খুবই অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক।

২৫ জুনের বোমা বিস্ফোরণ যেসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে ঘটেছিল তার একদিকে ছিল আল সৌদ রাজপরিবারের অভ্যন্তরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং অন্য দিকে এই পরিস্থিতি থেকে ফায়দা লোটার জন্য ইরানের মরিয়া প্রচেষ্টা। রাজ পরিবারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব জিহাদী হামলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেয়। হামলায় অংশগ্রহণকারী দলটি আফগান ও বলকান অঞ্চলের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ সৌদি জিহাদীদের নিয়ে গঠিত হলেও এবং ওসামা বিন লাদেনের সাহায্যপুষ্ট হলেও তারা ছিল ইরানী গোয়েন্দা সংস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণে। তেহরানের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া এই অভিযান তারা চালাতে পারত না। আল-খোবারের বিস্ফোরণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল আল-সৌদ রাজপরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করা কিংবা নিদেনপক্ষে এর ভিতরকে নড়বড়ে করে দেয়ার লক্ষ্যে ধারাবাহিক জিহাদী অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ। অভিযানটি শিয়া ইরানের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলেও এটি সৌদি সুন্নী মুজাহিদদের দিয়ে সংগঠিত করা হয়। প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো স্থানীয় নেটওয়ার্ককে

দিয়ে করা হয়। বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আনা হয় বেকা উপত্যকা এবং দামেস্কের কাছে সিরীয় ও ইরানী গোয়েন্দা বাহিনীর মজুদ থেকে। তৃতীয়ত, সুদক্ষ জিহাদীদের যাদের অীধকাংশই ছিল শিয়া ও ইরানী। দাহরানে আগমন শুরু হয় প্রস্তুতি পর্বের শেষ দিকে। এরা ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান কিংবা বসনিয়া-হারজেগোভিনার ঘাঁটি থেকে তৃতীয় দেশ হয়ে সৌদি আরবে আসে। এরাই ট্যাঙ্কার বোমা তৈরিসহ বোমা বিস্ফোণের আসল কাজটা করে। বিস্ফোরণটা ঘটায় সৌদিরা।

ওসামা বিল লাদেন আল-খোবারের অভিযানের প্রধান দিকগুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাজতন্ত্রবিরোধী সৌদি ইসলামী র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে সংস্রব থাকার কারণে তিনি যেমন তাদের সরল দিকগুলো জানতেন তেমনি জানতেন দুর্বল দিকগুলোও। অন্যদিকে রিয়াদের ক্ষমতার লড়াইয়ের ভিতরের গতি-প্রকৃতিও তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই অভিযান পরিচালনায় যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আল-খোবারের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ ছিল শিয়া এবং তারা ইরানের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। তবে নিরাপত্তার কারণে প্রাথমিক সাংগঠনিক কাজগুলো স্থানীয় সুন্নীদের দিয়ে করা হয়; যারা ছিল বিন লাদেনের অনুগত।

পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালের প্রথমদিকে সৌদি আরবের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েক ডজন সৌদি সুন্নী র‍্যাডিক্যাল যুবকদের রিক্রুট করে বেকা উপত্যকায় হিজবুল্লাহ (!) শিবিরগুলোতে জিহাদ ও গুপ্ত তৎপরতার ওপর চার থেকে ছয় সপ্তাহের কোর্স করতে পাঠানো হয়। শিক্ষা লাভ শেষে তারা সিরিয়া ও জর্দান হয়ে সৌদি আরবে ফিরে আসার পর তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। এরা বিস্ফোরণের কয়েক মাস আগে থেকে পেশাদারী গুপ্তচরবৃত্তি চালায়। এদের কেউ কেউ আল-খোবার সেনাছাউনির চার পাশটা আস্তে করে গাড়ি চালিয়ে ঘুরে দেখে। কেউ কেউ দূর থেকে বাইনোকুলার দিয়েও দেখে। একবার একটা ট্রাক ছাউনির চারপাশের বেড়া কত শক্ত যাচাই করার জন্য বেড়ার এক জায়গায় ধাক্কা লাগায়। বিস্ফোরণের দু'সপ্তাহ আগে বোমাবাহী ট্যাঙ্কারের ঠিক অনুরূপ একটি ট্যাঙ্কারকে কম্পাউন্ডে ঢোকার চেষ্টা করতে এবং তার পর চারপাশটা চক্কর মেরে যেতে দেখা গেছে। এসব ঘটনা ছিল বেমা বিস্ফোরণের আগের মাসগুলোয় পরিচালিত পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার অতিসমান্য অংশমাত্র। এ ধরনের তৎপরতা সৌদি আরবের অন্যান্য স্থানেও সম্ভাব্য টার্গেটগুলোকে লক্ষ্য করে পরিচলিত হয়।

চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে। এ সময় ইরানী গোয়েন্দা আফিসাররা সৌদি আরবে এসে প্রস্তুতির সব কিছু দেখেশুনে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যান। ১৯৯৬ এর মে মাসে দু'ধরনের সুদক্ষ জিহাদী সৌদি আরবে আসে। প্রথম দফায় আগতদের বেশির ভাগই ছিল সৌদি হিজবুল্লাহ (!) (শিয়া), সুন্নী আফগান, বলকান ও অন্যান্য। এরা ইরান, আফগানিস্তান-পাকিস্তান এবং বসনিয়া-হারজেগোভিনার ঘাঁটি থেকে সৌদি আরবে আসে। এরা এক সঙ্গে দু' তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আসে। এরা অভিযান পরিচালনার স্থান এবং বিকল্প টার্গেটগুলো দেখে নেয়। দ্বিতীয় জিহাদী দলটি জুনের প্রথম দিকে দাহরানে আসতে শুরু করে। এরা বেশির ভাগই ছিল শিয়া। সঙ্গত কারণেই স্থানীয় নেটওয়ার্কের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ঘটেনি।

### *অভিনব কৌশল তাকিয়ে ছিল বিশ্ব*

জুন মাসের মধ্যে বোমা তৈরির অধিকাংশ উপকরণ- উচ্চশক্তির বিস্ফোরক, দাহ্য প্রদার্থ ও অত্যাধুনিক ফিউজ সৌদি আরবে এসে যায়। বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ সিরিয়া থেকে জর্দান হয়ে আসে। অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও ফিউজগুলো পশ্চিম ইউরোপ থেকে কম্পিউটার পার্টস নাম দিয়ে চোরাচালান করে আনা হয়। ফিউজসহ মূল চালানের কিছু কিছু অংশ সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের ঠিকানায় আনা হয়েছিলো। ন্যাশনাল গার্ডের অভ্যন্তরে ইসলামী জিহাদীদের সমর্থক ছিল। তারাই এগুলো গ্রহণ করে লুকিয়ে রাখে। মধ্য জুনের আগেই আল-খোবার এলাকার ওপর অনুপুঙ্খ নজরদারির কাজ শেষ হয়। কয়েক সপ্তাহ আগে স্থানীয় নেটওয়ার্ক একটা ক্যাপ্রিস গাড়ি চুরি করে রেখেছিল। সেটি পরে পালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

ওটা পরে দাহরান থেকে ছয় মাইল দূরে দাম্মামে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। বোমা বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহৃত হয় মার্সিডিজ বেঞ্জ ট্যাঙ্কার ট্রাকটি ঘটনার মাত্র ক'দিন আগে একটি নির্মাণ কোম্পানীর গ্যারেজ থেকে চুরি করে নেয়া হয়। তার অর্থ, অভিযানের সামান্য আগেই বোমা তৈরির কাজে হাত দেয়া হয়েছিল। বিস্ফোরকের সঙ্গে তৈল ও দাহ্য পদার্থের মিশ্রণে এর বিধ্বংসী ক্ষমতা বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল। এ ধরণের বোমা সাধারণত ইরানী জিহাদীরা ব্যবহার করে থাকে। প্রস্তুতি সম্পন্ন করার অল্প পরই, খুব সম্ভবত অভিযানের আগে এক্সপার্ট জিহাদীরা দাহরান ত্যাগ করে। বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজটা তারা সৌদি জিহাদী হিজবুল্লাহ (!) সদস্যদের একটি ক্ষুদ্র দলের হাতে ছেড়ে দেয়। বলাবাহুল্য, সে কাজে তারা ব্যর্থ হয়নি।

### *সৌদি রাজপরিবারে ক্ষমতাদ্বন্দ্বের অন্তরালে*

১৯৯৫ সালের শেষদিকে বাদশাহ ফাহাদ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। যুবরাজ প্রিন্স আব্দুল্লাহ সৌদি আরবের অস্থায়ী শাসক মনোনীত হন। এই নিযুক্তি গোটা আল সৌদ রাজপরিবারের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ ঘটায়। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে বাদশাহ ফাহাদ আবার নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে প্রবাসে যেতে অস্বীকৃতিই শুধু জানালেন না, আমৃত্যু ক্ষমতা ধরে রাখার ইচ্ছাও ব্যক্ত করলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রিন্স আব্দুল্লাহর অবস্থান এমনিতেই অনিশ্চিত ছিল; সেটা আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে বাদশাহ ফাহাদের মৃত্যুসম্ভাবনাকে সামনে রেখে উত্তরাধিকারের লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। ১৯৯৫-৯৬ সালে সৌদি সিংহাসনের দখল নিয়ে আল-সৌদ পরিবারের অভ্যন্তরে তিনটি পৃথক পৃথক উপদলের মধ্যে লড়াই চলছিল। এগুলো হলো-

(১) ক্রমবর্ধমান হারে একঘরে হয়ে পড়া প্রিন্স আব্দুল্লাহ (২) প্রিন্স বন্দরের নেতৃত্বে সুদাইরির তরুণ বংশধররা, যাদের পিছনে প্রিন্স বন্দর ও প্রিন্স সুলতানের পূর্ণ সমর্থন ছিল এবং (৩) বাদশাহ ফাহদের অপর দুই আপন ভায়ের নেতৃত্বাধীন সালমান-নাইফ গ্রুপ, যারা সমঝোতার ব্যবস্থা হিসাবে প্রিন্স সালমানকে বাদশাহ করতে চাইছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, বাদশাহ ইবনে সৌদের প্রিয়তমা স্ত্রী হাসা-আল-সুদাইরির গর্ভজাত সাত পুত্র ছিল। বাদশাহ ফাহাদ ও অপর ছয় ভাই পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ। অন্যদিকে প্রিন্স আব্দুল্লাহ হচ্ছেন তাদের বৈমাত্রেয় ভাই। তথাপি উত্তরাধিকার বিধান অনুযায়ী প্রিন্স আব্দুল্লাহরই পরবর্তী বাদশাহ হওয়ার কথা। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে বাদশাহ ফাহাদের স্বাস্থের অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটেছে জেনে বাদশাহর আপন তিন ভাই সুলতান, সালমান ও নাইফ নিজেদের অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জোট বাঁধেন। প্রিন্স আব্দুল্লাহ

আনুষ্ঠানিকভাবে অস্থায়ী বাদশাহ হওয়ার পর সুদাইরির পুত্র ও পৌত্ররা মিলে তাঁকে ভবিষ্যতে সিংহাসনে বসতে না দেয়ার জন্য একাট্টা হয়ে ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকেন।

১৯৯৬ সালের প্রথমদিকে এই ষড়যন্ত্র তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু সুদাইরি পুত্রদের দু'টি উপদলের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলে। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে আব্দুল্লাহ উপসাগরীয় শীর্ষ বৈঠকে যোগদানের জন্য মাস্কটে গেলে সুদাইরি পুত্ররা একটা শান্তিপূর্ণ অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালায়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতান সুপ্রীম কাউন্সিল অব উলামা'র সদস্যদের তলব করে তাদের সমর্থন দাবি করেন, যাতে তিনি নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করতে পারেন। প্রিন্স সুলতান ১৯৯৫ এর নভেম্বরে রিয়াদের বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার জন্য প্রিন্স আব্দুল্লাহকে ন্যাশনাল গার্ডে' প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারেও উলামাদের সমর্থন কামনা করেছিলেন। বলেছিলেন যে, প্রিন্স আব্দুল্লাহ ন্যাশনাল গার্ডের আনুগত্য সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।প্রিন্স সুলতানের এসব উদ্যোগ অবশ্য অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল। কারণ তিনি উলামাদের সমর্থন আদায় করতে পারেননি। উলামা সম্প্রদায় তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তিনি সিংহাসনে বসার অনুপযুক্ত। শুধু তাই নয়, তার তাঁর এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রিন্স আব্দুল্লাহকেও জানিয়ে দিয়েছিল।

অন্যদিকে প্রিন্স আব্দুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। উলামাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকা সমর্থন করতেন। প্যান আরব ও প্যান ইসলামিক সংগ্রামেরও সমর্থক ছিলেন। তার মধ্যে খানিকটা পাশ্চাত্যবিরেধিতা ছিল। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন। এসব কারণে তিনি উলামা সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক মিত্র ছিলেন। তবে সুদাইরিভ্রাতাদের তরফ থেকে তার ক্ষমতার প্রতি ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবালায় শুধু উলামা সম্প্রদায়ের সমর্থনই যথেষ্ট ছিল না। এ জন্য তাকে আরেকটা পথও দেখতে হয়েছিল। সেই সমর্থনটা তিনি পেয়েছিলেন দামেস্ক থেকে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদের পরিবার তথা আসাদ ক্লানের সাথে প্রিন্স আব্দুল্লাহর এক বিচিত্র ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯৯৬ সালের বসন্তের প্রথম দিকে প্রিন্স আব্দুল্লাহর ইনার সার্কেলের কিছু সদস্য সুদাইরিভ্রাতাদের পতন ঘটানোর পরিকল্পনা নেয়। ঠিক হয় যে সিরীয় গোয়েন্দা সংস্থা ছোটখাটো ধরনের বেশকিছু মার্কিন বিরোধী সন্ত্রাসবাদী অভিযান চালাবে এবং তার জন্য দোষ চাপানো হবে বিভিন্ন ইসলামী জিহাদী সংগঠনের নামে। সন্ত্রাসবাদের এই আকস্মিক জোয়ারে ভারি বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে সুদাইরিরা।

কারণ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তাদেরই হাতে। প্রথমটি প্রিন্স নাইফের এবং পরেরটি প্রিন্স সুলতানের। তাদের এই ব্যর্থতার জন্য আমেরিকাও নাখোশ হবে। ফলে তাদের প্রতি মার্কিন সমর্থন কমবে। এ অবস্থায় তারা সৌদি সিংহাসনের জন্য আর উপযুক্ত বলে গণ্য হবে না। অন্যদিকে প্রিন্স আব্দুল্লাহর পরিচালনাধীন রয়াল গার্ড তথাকথিত "জিহাদী নেটওয়ার্ককে" ধ্বংস করে দেবে। এতে আব্দুল্লাহর জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি দুটোই বৃদ্ধি পাবে। সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনীতে তার ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট আসাদ ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এসব কার্যক্রম শুরু করার সবুজ সঙ্কেত দেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে প্রিন্স আব্দুল্লাহর পাশে সিরিয়ার এভাবে এসে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা একটা বদান্যতা। কিন্তু এখানে বদান্যতার ব্যাপার নেই। যা আছে সেটা হলো আদান-প্রদান। বিভিন্ন ইস্যুতে বাদশাহ ফাহাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আসাদের গভীর বিরোধ থাকলেও প্রিন্স আব্দুল্লাহ যখন অস্থায়ী বাদশাহ ছিলেন সে সময় সিরিয়া সৌদি আরবের কাছ থেকে বিশেষ আর্থিক সাহায্য লাভ করে, যার পরিমাণ বেশ কয়েক বিলিয়ন ডলার। তা ছাড়া সামরিক

ক্ষেত্রেও প্রিন্স আব্দুল্লাহ সিরিয়াকে বিপুল সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কাজেই সিরিয়া প্রিন্স আব্দুল্লাহর বিপদের সময় এগিয়ে আসবে এতে তেমন আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

*সৌদি প্রিন্সদের ক্ষমতাদ্বন্দ্বের শিকার হলেন লাদেন*

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের সবুজ সঙ্কেত এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সৌদি আরবে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার প্রস্তুতি নিল সিরীয় গোয়েন্দা বাহিনী। টার্গেট নির্বাচন করা হলো প্রধানত মার্কিন সামরিক স্থাপনা। সন্ত্রাসবাদীদের সৌদি আরব পাঠানো হলো। পাঠানো হলো অস্ত্র ও বিস্ফোরক। এ কাজে সাহায্য করল ইরান। আর ব্যবহার করা হলো জর্দানের ভূখন্ড। তবে অঘটন যে কিছু ঘটল না তা নয়। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে সিরিয়া ও জর্দান হয়ে আসা একটি সৌদি নম্বর প্লেট লাগানো গাড়ি আটকে দেয়া হলো সৌদি-জর্দান সীমান্তের ক্রসিং পয়েন্ট। নানা ধরনের মোট ৮৪ পাউন্ড ওজনের উচ্চশক্তির বিস্ফোরক ছিল ওতে। এর আগে রিয়াদের ১৩ নভেম্বরের বিস্ফোরণ ঘটনায় জড়িত হাসান আল-স্যারে নামে এক সৌদি নাগরিক পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল।

তাকে ওখান থেকে ধরে এনে অনেক গোপন তথ্য বের করে ফেলে সৌদি গোয়েন্দারা। তার কাছ থেকে জানতে পারে সৌদি আরবে অস্ত্রশস্ত্র ও লোকলস্কর আনার জন্য কোন পথটি ব্যবহার করেছিল জিহাদীরা।এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে যখন সৌদি আরবে জিহাদী হামলার আশঙ্কা বাড়ছিল। অন্যদিকে তখন এই ঘটনাগুলোকে সৌদি রাজপরিবারের ক্ষমতাদ্বন্দ্বে ব্যবহার করছিল বিভিন্ন পক্ষ। অবশ্য এক এক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেক রকম। প্রিন্স সুলতান, প্রিন্স সালমান ও প্রিন্স নায়িফ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান সংহত করার চেষ্টায় এই ঘটনাগুলো নিয়ে প্রচারযুদ্ধ চালাতে লাগলেন। তাতে দেখা গেল সৌদি রাজপরিবারে সালমান-নায়িফ পক্ষের-শক্তি বেশ বেড়ে গেছে। সেটা এতই বেড়েছে যে, এই পক্ষের ক্ষমতায় যাওয়ারও জোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতে শঙ্কিত হয়ে প্রিন্স সুলতান তখন একটা চাল চাললেন। তিনি জানতেন যে, রিয়াদের শাসকচক্রের একটা মহলের পক্ষ থেকে প্রিন্স সালমান গোপনে বিল লাদেনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছেন। উদ্দেশ্য বিন লাদেন ও তার বাহিনীকে সৌদি আরবের বাইরে জিহাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে প্ররোচিত করা। এ জন্য ঐ মহলটি বিন লাদেনের পিছনে বেশ টাকাপয়সা ঢালত তার ইসলামী বিপ্লব সাহায্য করার নামে। লাদেন আবার কখন সৌদি আরবের দিকে নজর দিয়ে বসেন সেটাই ছিল তাদের ভাবনার বিষয়। প্রিন্স সালমান-নায়িফ উপদলটিকে কোণঠাসায় ফেলার জন্য ১৯৯৬ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে প্রিন্স সুলতান বাদশাহ ফাহাদের নামে একটা অনুরোধ জানান সুদানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল বসিরের কাছে।

জেনারেল বসির তখন হজ্জ করতে মক্কায় এসেছিলেন। প্রিন্স সুলতানের অনুরোধটা ছিল এই যে, বিন লাদেনকে সুদান থেকে বের করে দিতে হবে। বিনিময়ে সৌদি আরব সুদানকে বিপুল আর্থিক সাহায্য দেবে।প্রেসিডেন্ট বসিরের মে মাসের মাঝামাঝি বিন লাদেন ও তার সহচরদের সুদান থেকে বহিস্কারের আদেশ দেন। প্রিন্স সুলতানের প্রভাবাধীন সৌদি পত্রপত্রিকায় সুদান থেকে লাদেনের বহিস্কারকে সৌদি কূটনীতির বড় ধরনের বিজয় এবং সৌদি আরবের অভন্তরীণ নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে অভিনন্দিত করা হয়।

এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রিন্স সুলতানের উপদলটির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং প্রিন্স সালমান-নায়িফ উপদলটি খানিকটা কোণঠাসা হয়। কিন্তু উলামাদের সঙ্গে সংঘাত বাধায় এবাং তাদের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় প্রিন্স সুলতান শেষ পর্যন্ত সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করেন। বরং তার ছেলে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বন্দর বিন সুলতান যাতে পরবর্তী সৌদি বাদশাহ হতে পারে তা নিশ্চিত করতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগে লেগে যান। প্রিন্স সুলতান তরুণ প্রজন্মের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনার জন্য রিয়াদে সুদাইরীর পক্ষের সকল প্রবীণ ও নবীন সদস্যের জরুরী বৈঠক ডাকেন। প্রিন্স সুলতান তরুণ শাহজাদাদের হুঁশিয়ার করে দেন যে, তার পিছনে সবাই একাট্টা হয়ে না দাড়ালে তারা সমস্ত ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা হারাবে। সোজা কথায় একটা সুদৃঢ় ঐক্যফ্রন্ট রচনা করতে হবে। বৈঠকে প্রিন্স সুলতান জানান যে, প্রিন্স আব্দুল্লাহ অচিরেই ক্ষমতায় আসছেন।

তখন সুদাইরীদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই খর্ব হবে। তবে আব্দুল্লাহর যা বয়স তাতে তার শাসনকাল হবে একটা ক্রান্তিকাল মাত্র। সুতরাং সুদাইরীদের সামনে আসল চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের শাহাজাদাদের জন্য ক্ষমতা দখল করা ও তা ধরে রাখা। প্রিন্স সুলতান সোজা কথায় বলতে চাইলেন যে, তার ছেলে প্রিন্স বন্দরকে ঘিরেই যেন পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং এ ব্যাপারে যেন সবাই সমর্থন জানায়। প্রিন্স সুলতান তার এই উদ্যোগের পিছনে বাদশাহ ফাহাদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হলেন। এর কিছুদিন পরই দ্বিতীয় প্রজন্মের শাহজাদাদের যৌথ নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে প্রিন্স বন্দর বিন সুলতান এবং বাদশাহর পুত্র প্রিন্স মোহাম্মদ বিন ফাহাদের মধ্যে একটা গোপন চুক্তি হয়। চুক্তির প্রতি তাদের দু'জনের পিতার বাদশাহ ফাহাদ ও প্রিন্স সুলতানের সমর্থন ছিল। প্রিন্স বন্দর এরপর থেকে নিজেকে বাদশাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। ক্ষমতার সুতীব্র লড়াইয়ের মধ্যে তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নেন।

এসব সুবিধার মধ্যে একটি ছিল রাজকীয় গ্যারান্টি, যে গ্যারান্টিবলে তিনি আব্দুল্লাহর ভাবী রাজদরবারে এমন উচু পদ পাবেন যেখান থেকে সিংহাসন দখল করা সহজ হবে। মে মাসে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, প্রিন্স সুলতানের উপদলটি কার্যত এই গ্যারান্টি দিতে সক্ষম হয় যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের সুদাইরীদের মধ্যে শীর্ষস্থানটিতে থাকবেন পিন্স বন্দর অন্য কেউ নন। এমনকি প্রাক্তন বাদশাহ ফয়সালের দুই পুত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সৌদ আল ফয়সাল এবং গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান প্রিন্স তুর্কি আল ফয়সালও নন। মে মাসের শেষ দিকে প্রিন্স সালমান-নায়িফ উপদলটির ক্ষমতা সহসা বেড়ে যাওয়ায় প্রিন্স বন্দর ও প্রিন্স মোহাম্মদ তাদের পরিকল্পনাকে তরান্বিত করে তোলেন।

### *তালেবানরা বিন লাদেনকে কিভাবে নিল*

ওসামা বিন লাদেনের আফগানিস্তানে অবস্থান সম্ভব হয়েছে তালেবানদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। এই সমর্থন না পেলে তার কি পরিণতি হতো কিছুই বলা যায় না। বৈরী শক্তির হাতে ধরা পড়া বা নিহত হওয়ার তার সমূহ আশঙ্কা ছিল। লাদেন আফগানিস্তানে আসেন ১৯৯৬ সালে মে মাসে। আর তালেবানরা কাবুল দখল করে সে বছরের সেপ্টেম্বরে। অবশ্য কাবুল দখলের বেশ আগেই তালেবানরা আফগানিস্তানের প্রধান সামরিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী জিহাদে বিন লাদেনের অবদানের কথা ভালভাবেই জানা ছিল তালেবানদের।তদুপরি লাদেনের বিশ্বব্যাপি ইসলামী জিহাদের দৃষ্টি ভঙ্গির সঙ্গে তালেবানদের দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক দিক দিয়ে মিল ছিলো। তালেবানরাও বিশ্বজুড়ে

সীমান্তমুক্ত ইসলামী সমাজ কায়েমের কথা বলে এসেছে। তাই লাদেনকে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানে তালেবানদের ওয়াদাবদ্ধ থাকাই স্বাভাবিক।

তালেবানরা লাদেনের সঙ্গে তাদের প্রথম সাক্ষাতের পূর্বে থেকেই সহমর্মিতা ও সংহতির পরিচয় দিয়েছে। তালেবানদের একটি প্রতিনিধি দল জালালাবাদে লাদেনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। সেখানে লাদেনের প্রতি বিপুল সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়ে এক তালেবান কমান্ডার বলেন: হে শেখ! আমাদের এই ভূখ- আফগান ভূখন্ড নয়, এ ভূখন্ড আল্লাহর। আমাদের জিহাদও আফগানদের জিহাদ নয়, বরং সকল মুসলমানদের জিহাদ। তোমার অনুগত শহীদরা আফগানিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলেই ছড়িয়ে আছে, তাদের কবরই তার স্বাক্ষর। তুমি যে মাটির উপর দিয়ে হেটে যাও সেটাকে আমরা পবিত্র বলে জ্ঞান করি। লাদেনের প্রতি এ ছিল তালেবানদের সুগভীর অনুভূতির প্রকাশ। একারণে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের হুমকি, ভয়ভীতি ও প্রলোভন সত্ত্বেও আফগানিস্তানে তাঁর নিরাপদ আশ্রয় সম্ভব হয়েছিল। তালেবানরা আফগানিস্তানের মাটিতে লাদেনের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে অন্য আর কোন বিষয়ের প্রতি নজর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু করেছিল তাদের তৎকালিন নেপথ্য চালিকা শক্তি পাকিস্তানের আইএসআই। লাদেনকে নিয়ে যাতে সৌদি নেতৃবৃন্দের সাথে বড় ধরনের কোন বিরোধে জড়িয়ে পড়তে না হয়, বিচক্ষণ আইএসআই কমান্ডাররা তা নিশ্চিত করতে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন।

১৯৯৭ সালে এপ্রিল মাসে সৌদি গোয়েন্দা প্রধান তুর্কী আল-ফয়সাল বেশ কয়েকবার আইএসআই-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, সৌদি আরবে বিভিন্ন জিহাদী ঘটনার সঙ্গে লাদেন জড়িত ছিলেন। এথেকে আইএসআই ধরে নেয় যে, সৌদি আরব লাদেনকে ফেরত চাইতে পারে। ফেরত চাইলে তাকে ফেরত দিতেই হবে এমন ধারণার বশবর্তি হয়ে আইএসআই তালেবানদেরই একটি দলকে দিয়ে লাদেনকে কান্দাহারে শিথিলভাবে গৃহবন্দি করে রাখে। কিন্তু ক'দিন পর পাকিস্তানে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত আনুষ্ঠানিকভাবে জানান যে, "বিন লাদেন সৌদি আরবে কোন অপরাধ করেননি এবং সৌদি আরবও তাকে কখনো গ্রেফতারের দাবি জানায় নি"। ব্যাপারটা অতিব লক্ষণীয় যে, তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তালেবান নেতৃবৃন্দ ও আইএসআই হাই কমান্ডের সঙ্গে প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সালের সঙ্গে কয়েক ডজনবার বৈঠক হয়েছে। কিন্তু কখনই তিনি বা সৌদি সরকারের অপর কোন প্রতিনিধি এ বক্তব্য প্রত্যাহার করেননি। কিংবা বিকল্প কোন বক্তব্যও দেননি।

### *সৌদি রাজতন্ত্র সম্পর্কে বিন লাদেন*

ব্রিটেনের "দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট" পত্রিকার সাংবাদিক রবার্ট ফিস্কের সঙ্গে সাক্ষাতকারে বিন লাদেন তাঁর সৌদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণগুলো ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, উপসাগর যুদ্ধের অজুহাতে আমেরিকাকে সৌদি আরবে ঘাঁটি গেড়ে বসতে দেয়া ছিল প্রধানতম কারণ। তবে আল-সৌদ রাজপরিবারের সঙ্গে তার যেটুকুবা ঘনিষ্ঠতা ছিল জনপ্রিয় উলামা শেখ উদাহ ও তার সমর্থকদের গ্রেফতারের পর সেটুকুও শেষ হয়ে যায়। বিন লাদেন বলেন যে, শেখ উদাহকে কারাগারে পাঠানোর মধ্য দিয়ে আল- সৌদ রাজপরিবার দেশ শাসনের বৈধতা হারিয়ে ফেলেছে।

সাক্ষাতকারে বিন লাদেন সৌদি আরবের অর্থনৈকিত সঙ্কট এবং সে কারণে জনগণের দুর্ভোগের জন্য রাজতন্ত্রকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, "সৌদি ব্যবসায়ীরা দেখতে পেল কিভাবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা হচ্ছে। কিভাবে তাদের কাছে সরকারী ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ব্যবসায়ীদের কাছে সরকারের ঋণের পরিমাণ আজ ৩৪ হাজার কোটি সৌদি

রিয়াল। যা হচ্ছে এক বিশাল অঙ্ক। এটা হলো সৌদি আরবের অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনগণকে বিদ্যুত, পানি ও জ্বালানির জন্য অধিক মূল্য দিতে হচ্ছে। সৌদি কৃষকগণ ঋণভারে ক্লান্ত। শিক্ষার দ্রুত অবনতি ঘটে চলেছে। লোকে এখন সরকারী স্কুল থেকে সন্তানদের সরিয়ে ব্যয়বহুল বেসরকারী শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছে।

" বিন লাদেন বলেন, "সৌদিরা এসব সঙ্কটের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে। তাদের মনে আছে, বিশিষ্ট আলেম শেখ উদাহ তাদেরকে কি বলেছিলেন। তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমেরিকাই হলো তাদের যাবতীয় সমস্যার মূল কারণ। সাধারণ মানুষটিও জানে, তাদের দেশ হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ। তথাপি হাজারো করের বোঝা ও অন্যান্য কারণে তাকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। লোকে আজ বুঝতে পারছ যে, সৌদি আরব আমেরিকার উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। তারা আজ আমেরিকাকে সৌদি আরব থেকে লাথি মেরে তাড়াতে চায়। রিয়াদ ও খোবারে যা ঘটেছে তা হচ্ছে আমেরিকার বিরুদ্ধে সৌদি জনগণের প্রচন্ড ক্রোধের সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ। সৌদিরা এখন জানে, তাদের প্রধান শত্রু আমেরিকা। যে দেশে এক শ' বছরের মধ্যে কেউ কখনও বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনেনি, সেখানে খোবারে ২৫০০ কিলো টিএনটির বিস্ফোরণ হলো আমেরিকার দখলদারির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের প্রমাণ।"

এটাই শেষ কথা নয়। বিন লাদেন বলেন, সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতিই যে শুধু তার আমেরিকা বিরোধিতার কারণ, তা নয়। আরও কারণ আছে। তা হলো আমেরিকা বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত হানছে। বিশ্ব মুসলিমদের সঙ্গে তার সহমর্মিতাই তাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। তিনি বলেন, " খোবারের বিস্ফোরণ শুধু মার্কিন দখলদারির বিরোধিতা হিসাবে নয়, উপরন্তু বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের প্রতি আমেরিকার বৈরী আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও ঘটেছে। এ বছরের গোড়ার দিকে (১৯৯৬সাল) আত্মোৎসর্গী বোমা বিস্ফোরণে যখন ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ৬০ ইহুদী নিহত হলো। বিশ্বজুড়ে তখন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করা হলো। অথচ ইরাকের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবার পর যখন ৬ লাখ ইরাকী শিশুর মৃত্যু হলো তখন তেমন কোনই প্রতিক্রিয়া হলো না। এই ইরাকী শিশুদের হত্যার ঘটনাটা হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড। আমরা মুসলমানরা ইরাকী শাসকগোষ্ঠীকে পছন্দ করি না ঠিকই, তথাপি আমরা মনে করি ইরাকী জনগণ আমাদের ভাই, ইরাকী শিশুরা আমাদের সন্তান।" বিন লাদেন বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি ইসলামপন্থীদের মধ্যে আসন্ন সংঘাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই। ... এই সঙ্কটের শুধু একটাই সমাধান।

তা হলো, সৌদি আরব থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। ...এই লড়াই হবে এক বৃহত্তর পরিসরে লড়াইয়ের সূচনা। যা গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।"বিন লাদেনের বয়ান ছিল ১২ পৃষ্ঠার এক দলিল, যার শিরোনাম ছিল "ডিক্লেয়ারেশন অব ওয়ার" বা যুদ্ধের ঘোষণা। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার অবস্থানের কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রাসঙ্গিক বিষয় ও প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বয়ানে আমেরিকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আফগানিস্তানে ইসলামী শক্তির হাতে ইতোমধ্যে সোভিয়েতের মতো একটি পরাশক্তির পরাজয় ঘটেছে।

*আবু নিদালের সাথে যোগাযোগ*

ক্ষমতায় আসার পর তালেবানরা ওসামা বিন লাদেনের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। জালালাবাদে বিন লাদেনকে তারা তার ঘাঁটিগুলো রাখার অনুমতিই শুধু দেয়নি, সেগুলোকে রক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল।বিন লাদেন নিজেও তালেবান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। আফগানিস্তানে তখন চার শ'রও বেশি আরব যোদ্ধা ছিল। এদের অনেকে সোভিয়েতবিরোধি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আবার অনেকে বিভিন্ন জিহাদী প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিল। তালেবানরা চাইছিল এই আরবরা যেন আফগানিস্তান থেকে গিয়ে তালেবানদের সামরিক কার্যক্রমগুলোতে অংশ নেয়।

১৯৯৬ সালের অক্টোবর থেকে তালেবানরা তাদের বিশেষ বাহিনীতে আফগান যুদ্ধাভিজ্ঞ আরবদের সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে রিক্রুট করতে থাকে। এ বিষয়টা তারা পাকিস্তানের আইএসআইকে জানাতে ভুলেনি। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি আইএসআই তালেবানদের পাকিস্তানের জামাতে ইসলামীর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিজবুল মুজাহিদীন পরিচালিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো বন্ধ করে দিতে বলে। কিছুদিন পর তারাই আবার এসব শিবির হরকত-উল-আনসারের হাতে তুলে দেয়ার অনুরোধ জানায়। বাহ্যত এর উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীর জিহাদে সাহয্য করা। নভেম্বরের শেষদিকে আইএসআই নিজেও খোস্ত এলাকায় তাদের প্রশিক্ষণ অবকাঠামো হরকত-উল-আনসারের কাছে হস্তান্তর করে। জিহাদী সংগঠন হরকত-উল-আনসার ছিল আইএসআই-এর কাঠোর নিয়ন্ত্রণে। কাশ্মীর ছাড়াও হরকতের সদস্যরা আজও বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে বার্মা, তাজিকিস্তান, বসনিয়া, চেচনিয়া এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত তৎপর আছে। হরকতের সদস্যদের মধ্যে পাকিস্তানী, কাশ্মীরী, আফগান, আরব প্রভৃতি জাতির লোকজন আছে।

তালেবানদের ক্ষমতা দখলের পরও আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আইএসআই-এর প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বিনা বাধায় চালু ছিল। এ সময় পরবর্তী দফা জিহাদী অভিযানের ব্যাপকভিত্তিক অবকাঠামো সংহত করে তোলার ক্ষেত্রে ওসামা বিন লাদেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে খার্তুমে জিহাদী শীর্ষ বৈঠক থেকে আফগানিস্তানে ফিরে আসার পথে তিনি তেহরানে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে সাবরি আল-বানা (আবু নিদাল) সহ বেশ কয়েকজন জিহাদী নেতার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। তারা মধ্য প্রাচ্যের গোটা তল্লাট জুড়ে জিহাদী অভিযানের বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেন। বিন লাদেন ও আবু নিদাল গোটা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে গুপ্তহত্যা, সারোটাজ, বোমাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের জিহাদী হামলায় নিদালের লোকবল ও অস্ত্রসম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখেন। আবু নিদালের তখন পৃষ্ঠপোষক ছিল ইরান। তা সত্ত্বেও আবু নিদাল এসব অভিযান চালানোর জন্য লাদেনের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ চেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তেহরানে অবস্থানকালে আরও একটা কাজ করেছিলেন বিন লাদেন।। তা হলো মিসরের বিভিন্ন জিহাদী সংগঠনের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করা।

তেহরানের প্রাধান্যপুষ্ট হিজবুল্লাহ ইন্টরন্যাশনালে বিন লাদেন তখনও বেশ উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই অবস্থান থেকে তিনি আফগানিস্তানে তাঁর জিহাদী অবকাঠামো বিস্তারের জন্য ইরানের ব্যাপক সাহায্য চেয়ে বসেন। কিন্তু তখন কাবুল ও তেহরানের সম্পর্কে ভাঙ্গন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল বলে এই সাহায্যের বিষয়টা বেশ স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায়

ইরান লাদেনকে আফগানিস্তানে তাঁর নিরাপদ আশ্রয় কোনভাবে নষ্ট না করার পরামর্শ দেয় এবং তাঁকে আশ্বাস দেয় যে, ইরানের সাহায্য তিনি পাবেন ঠিকই। তবে সেটা সরাসরি নয়, পাকিস্তানের হাত দিয়ে। ইসলামী আন্দোলনের আঞ্চলিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা ও মতবিনিময়ের জন্য হিজবুল্লাহ ইন্টরন্যাশনালের অন্যতম নেতা হিসাবে বিন লাদেনকে প্রায়ই তেহরানে যেতে হতো। এই সফর ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি তেহরানে এক বৈঠকে যোগদান করেন। যেখানে ইরানী গোয়েন্দা সংস্থা "ভিভাগ" এর শীর্ষ কর্মকর্তারা এবং আহমদ শাহ মাসুদের সহকর্মীদের নেতৃত্বাধীন একটি আফগান প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল।

ব্যাপারটা লাদেনের জন্য বেশ নাজুক ও বিব্রতকর হওয়ারই কথা। কারণ তখনও তিনি তালেবানদের আতিথ্য ও নিরাপত্তা ভোগ করছিলেন। অন্যদিকে আহমদ শাহ মাসুদ তখনও ছিলেন তালেবানদের অন্যতম বড় শত্রু । যিনি আফগানিস্তানের বন্ধুর উত্তর পূর্বাঞ্চল দখল করে রেখেছিলেন। কিন্তু বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে আফগানিস্তান সংক্রান্ত কোন বিষয় ছিল না বলেই সম্ভবত লাদেন তালেবানদের বিরাগভাজন হননি। তাঁরা তাঁকে যথারীতি আগের মতোই সমাদর করেছিল। তোহরান বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর আরবদের মধ্য থেকে বিশুদ্ধ ইসলামপন্থীদের নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং নতুন গোয়েন্দা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। বর্তমান ইসলামী জিহাদী সংগঠনগুলোর ওপর পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্রমবর্ধমান দৃষ্টি পড়ায় এটা দরকার হয়ে পড়েছিল।

ওসামা বিন লাদেন এই নয়া সংগঠনের প্রস্তুতিমূলক কাজকর্মের প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে আবির্ভূত হন। নয়া ব্যবস্থাটি হচ্ছে বহুস্তরবিশিষ্ট। এতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এই যে, বিপুলসংখ্যক সম্ভাব্য জিহাদীকে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে প্রাথমিক ও মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এদের মধ্য থেকে অধিক সম্ভাবনাময় প্রার্থীদের এরপর উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য ইরানের মাশাদে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ওসামা বিন লাদেন মাশাদে নতুন হেডকোয়ার্টারও স্থাপন করেন। যাতে করে আফাগনিস্তানের পরিস্থিতি তাঁর জন্য অসহনীয় হয়ে উঠলে তিনি সেখানে চলে যেতে পারেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত কোম শহরে তিনি একটা বাড়িও কেনে ফেলেন নিজের জন্য।

### *বিন লাদেনের ঘাটি*

আফগানিস্তানে বিন লাদেনের উদ্যোগে জিহাদের এক নতুন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে বিন লাদেন ও তালেবানরা খোস্তা-এর কাছে খাস্তেতে বদর-১ ও বদর-২ শিবির চালাতে থাকে। খাস্ত এলাকাটি পাকিস্তান সীমান্তের কাছে অবস্থিত। আইএসআইও আগের মতোই এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। বদর-১ এবং বদর-২ এই দুটো শিবিরে আলোচ্য সময় প্রায় ৬শ' বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক ছিল। এদের অনেকেই আরব। বাকিরা প্রধানত পাকিস্তানী, ভারতীয় কাশ্মীরী, ফিলিপিনো এবং ক্রমবর্ধমান হারে মধ্য এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চলের লোক। এখানে আরেকটি কথাও বলে রাখা ভাল, তা হচ্ছে বদর শিবির দুটোই একটা নতুন সড়ক ব্যবহার করে থাকে।

সর্ব আবহাওয়ার উপযোগী এই সড়কটি ১৯৯৬ সালে নির্মিত হয়েছে। এই সড়কের মাধ্যমে খাস্তে এলাকাটি পাকিস্তানের মিরান শহরের সঙ্গে যুক্ত। ওদিকে আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিন লাদেন ও তালেবানরা শিনদান্দ, ওয়াহবান ও

ফারাহ জেলায় তিনিটি গুচ্ছ গুচ্ছ প্রশিক্ষণ শিবিরও পরিচালনা করে। সে সময় শিবিগুলোতে এক হাজারের মতো আরব স্বেচ্ছাসেবক ট্রেনিং নিচ্ছিল। ইসলামী জিহাদীদের নাশকাতামূলক কার্যকলাপের ক্রমবর্ধমান হুমকি সম্পর্কে ১৯৯৭ সালের প্রথমদিকে মিসরীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্টে বলা হয় যে, "ওসামা বিন লাদেন আফগান তালেবান আন্দোলনের ছত্রছায়ায় আসলে গোপনে গোপনে আরব জিহাদীদের এক নতুন গ্রুপ গড়ে তুলছেন। যার লক্ষ্য হচ্ছে বেশকিছু আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রে জিহাদী সংগঠন সৃষ্টি করা। এই তৎপরতার মূল ধারাটি আফগানিস্তান ইরান ও সুদানের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হলেও এর প্রাণকেন্দ্র রয়েছে আফগানিস্তানের খোরাসান প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে- যেখানে অসংখ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।" রিপোর্টে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় যে, এই উদ্যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বেশকিছু আরব ও ইসলামী দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করা। গেরিলা প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনা করা ছাড়াও বিন লাদেন খোরাসানের পার্বত্য এলাকায় কায়েকটা সুরক্ষিত ঘাঁটি ও সদর দফতরও স্থাপন করেছিলেন।

এসব ঘাঁটি ও সদর দফতর ছিল গভীর গিরিগুহার ভিতরে লুকানো। সম্প্রতি ঐ ঘাঁটিগুলো দেখে এসেছেন "আল কুদস-আল আরাবী" পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল বারী আতওয়ান। তিনি জানান, "ঈগলের বাসা" বলে আখ্যায়িত আরব যোদ্ধাদের এই ঘাঁটিগুলো তুষারাচ্ছাদিত পর্বতের ৮২০০ ফুট উঁচুতে গিরিগুহায় অবস্থিত। অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী সেই ঘাঁটিগুলোর নিরাপত্তায় নিয়োজিত। ঘাঁটি অভিমুখী সড়কগুলো বিমান বিধ্বংসী কামান, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান দ্বারা সুরক্ষিত। সর্বত্রই রয়েছে চেক পয়েন্ট। রক্ষীদের সঙ্গে রকেট লাঞ্চারও আছে। এমনকি যে কোন বিমান হামলা মোকাবিলার জন্য ষ্ট্রিংগার ক্ষেপাণাস্ত্রও আছে।

সভ্যজগত বা লোকালয় থেকে বিন লাদেনের ঘাঁটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেও বিশ্বের বাকি অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার উত্তম ও আত্যাধুনিক ব্যবস্থাও আছে সেখানে। ঘাঁটিতে ছোটখাটো জেনারেটর আছে, কম্পিউটার আছে। আধুনিক গ্রাহক সরঞ্জাম আছে। তা ছাড়া হাজার রকমের তথ্য সংরক্ষণের প্রচলিত ও অত্যাধুনিক উভয় রকম ব্যবস্থাও আছে। সমস্ত আরব ও বিদেশী পত্রপত্রিকার প্রেস কাটিং সযত্নে সংরক্ষিত রাখা হয়ে থাকে সেখানে। বিন লাদেন লন্ডন ও উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে দৈনিক প্রেস রিপোর্ট পান। অর্থাৎ দুনিয়ার ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রতিদিনই তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। আতওয়ান বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও কমান্ডারদের বুদ্ধিবৃত্তিগত গুণাবলী দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এই মানুষটির চারপাশে যেসব মুজাহিদ আছেন তাঁদের বেশির ভাগই আরব। এরা বিভিন্ন বয়সী হলেও অধিকাংশই তরুণ।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় ডিগ্রীর অধিকারী তাঁরা। আবার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকও আছেন। তাঁরা পরিবার পরিজন চাকরিবাকরি ছেড়ে এসে আফগান জিহাদে যোগ দিয়েছিলেন। এখন কাজ করছেন লাদেনের সঙ্গে। এমন স্বেচ্ছাসেবকের অভাব নেই যারা সর্বদাই শাহাদাতবরণের জন্য প্রস্তুত। বিন লাদেনের প্রতি মুজাহিদদের শ্রদ্ধার কোন সীমা পরিসীমা নেই। বিন লাদেনকে রক্ষার জন্য তাঁরা প্রত্যেকে জীবন দিতে প্রস্তুতই শুধু নয়, যে কোন মহল থেকে তাঁর সমান্যতম ক্ষতি করা হলে তার উপযুক্ত বদলা না নিয়ে তাঁরা ছাড়বে না- এমন প্রবল তাঁদের ভালবাসা এই মানুষটির প্রতি। আফগানিস্তান থেকে বিন লাদেনকে বের করে দেয়ার জন্য সৌদি আরব ও মিসরের মতো প্রধান আরব দেশগুলোর দিক থেকে প্রবল চাপ আসা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তালেবান ও পাকিস্তানীরা তাঁর নিরাপত্তার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করে রেখেছে।

১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে কাবুল সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বিন লাদেনকে সমর্থন ও নিরাপত্তা দানের কথা ঘোষণা করে। ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহার করে তালেবান তথ্যমন্ত্রী আমীর খান মুত্তাকি বলেন "ওসামা বিন লাদেন আমাদের সম্মানিত মেহমান এবং মেহমানকে রক্ষা করা মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব"। মুত্তাকি তখন স্বীকার করেছিলেন যে, বিন লাদেন নানগরহর প্রদেশের জালালাবাদের কাছে "তোরা বুড়া" সামরিক ঘাঁটিতে বসবাস করছেন। বিন লাদেনের সঙ্গে আছেন তাঁর ৫০ সহকর্মী। এদের ৪০ জনই পরিবার পরিজন নিয়ে আছেন। এছাড়া তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর নিজের পরিবার এবং অসংখ্য দেহরক্ষী। তোরা বুড়ায় বিন লাদেন পাথরের তৈরি একটি ভবনের মধ্যে তার অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করেছেন। ঘাঁটির চারদিকে আছে সন্ধানী পোস্ট, কয়েকটি ট্যাংক এবং স্থল ও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তোরা বুড়া ঘাঁটিটি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ রক্ষার কাজে এবং পাকিস্তান হয়ে আরব ও অন্যান্য দেশের মুসলমানদের আফগানিস্তানে আসা যাওয়ার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

### *আলবেনিয়ায় গেরিলা শিবির স্থাপন*

ওসামা বিন লাদেন ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আমেরিকান ও ইহুদীবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য সৌদি আরবসহ গোটা মুসলিম বিশ্বের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। জিহাদের এই বানীতে তিনি আমেরিকানদের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়ে বলেন, অন্য যে কোন বিষয়ে শক্তি অপচয় করার চেয়ে একজন আমেরিকান সৈন্য হত্যা করতে পারা ঢের ভাল।বিশ্বময় জিহাদ ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান সম্বলিত তাঁর অসংখ্য বাণীর মাধ্যে এটা ছিল প্রথম বাণী। ১৯৯৭ সালের মার্চের প্রথমদিকে তিনি আরেকটা বানী দেন। এবার আমেরিকানদের বিরুদ্ধে তাঁর হুমকিটা ছিল আরও জোরালো ও শাণিত। তাতে তিনি বলেন, পবিত্র ভূমি সৌদি আরব দখল করে রাখার কারণে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার হতে থাকবে। আফগানিস্তানে থেকে বিন লাদেন যেমন নিজের অবস্থান সংহত ও মার্কিনবিরোধী প্রচারযুদ্ধ তীব্রতর করে তুলছিলেন, অন্যদিকে তখন পারস্য উপসাগরীয় এলাকা ও বলকান অঞ্চলে ইসলামী র‍্যাডিকেলরা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে চলছিল।

১৯৯৭ সালের প্রথমদিকে বিন লাদেন আলবেনিয়ায় গেরিলা প্রশিক্ষণ শিবির ও সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। এই শিবিরগুলো র‍্যাডিকেল ইসলামপন্থীদের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। সারায়েভো কর্তৃপক্ষ কোন কারণে তাদের ইসলামী মিত্রদের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেও সে ক্ষেত্রে এই শিবিরগুলোর বদৌলতে তাদের তৎপরতা চালাতে কোনরকম অসুবিধায় পড়তে হতো না। তাছাড়া এসব শিবিরের সমর্থনে কসোভোয় ইসলামী গেরিলাদের তৎপরতা বিস্তার করাও সহজ হয়। পাকিস্তান ও সুদান থেকে আলবেনিয়ার শিবিরগুলোতে ১শ'রও বেশি বিশেষজ্ঞ মুজাহিদ পাঠানো হয়েছিল। এরা প্রধানত ছিল আরব। বাদবাকি জিহাদীরা নানা ধরনের ইসলামী দাতব্য ও ধর্মীয় সংগঠনের ছত্রছায়ায় আগে থেকেই বসনিয়া-হারজেগোভিনায় তৎপর ছিল। বলাবাহুল্য, এ সময়ের দিকে বসনিয়া ও আলবেনিয়ায় ইসলামী মানবিক ও সাহায্য সংগঠনের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

১৯৯৭ সালের জুন মাসের শেষদিকে সুদানের ধর্মীয় নেতা হাসান আল তুরাবি পাশ্চাত্যের ওপর নতুন করে আঘাত হানার মধ্য দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া ইসলামী আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চারের লক্ষ্যে খার্তুমে সুন্নী জিহাদী নেতাদের এক গোপন বৈঠক

ডাকেন। এতে ওসামা বিন লাদেন নিজে অংশ না নিলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন আইমান আল জাওয়াহিরি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জিহাদের নামে আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসলামী জিহাদী তৎপরতা প্রসারিত ও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হয়। আগষ্ট মাসের মধ্যেই সুদানের ইসলামী শিবিরগুলোতে জোর প্রস্তুতির ভাব চোখে পড়ে। এ সময় ওসামা বিন লাদেন পর্যবেক্ষণ সফরে সুদানে আসেন। জিহাদী অভিযান পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করে তিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে নিয়োজিত তাঁর শক্তি ও সম্পদের এক বড় অংশ আসন্ন জিহাদী অভিযানে নিয়োগ করায় অঙ্গীকার করেন। এ সময় সুদানের আল-দামাজিনে বিন লাদেনের খামারে বিশেষজ্ঞ জিহাদীদের জন্য বিশেষ শিবির স্থাপন করা হয়।

### *সৌদি আরব-তালেবান-লাদেন*

আফগানিস্তানে তালেবান শক্তির উত্থান ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পিছনে সাহায্য-সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের পরই সৌদি আরবের স্থান। বিশেষ করে এক্ষেত্রে সৌদি তহবিলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তালেবানী মার্কা ইসলামী বিপ্লবের সাথে সৌদি আরবের আল-সৌদ রাজরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিগত কোন পার্থক্য নেই।(!) সৌদি আরবের সাথে তালেবানদের অত্মিক নৈকট্য অতি প্রবল। কারণ তালেবানদের হার্ডকোর অংশটা হচ্ছে পাকিস্তানের মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আফগান শরণার্থী। এসব মাদ্রাসার ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতা সৌদি আরবের ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ডিগ্রী লাভ করেছেন। এঁরা আসার সময় কঠিন ও রক্ষণশীল ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও আইনশাস্ত্র সঙ্গে করে এনছিলেন এবং সেগুলোর শিক্ষা আফগান ও পাকিস্তানী ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। আরেকটি ব্যাপারও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে সৌদি রাজপরিবার ও তালেবানী নেতৃত্ব উভয়েই ওয়াহাবী ভাবধারার অনুসারী।

তালেবানদের পিছনে সৌদি শাসকশ্রেণীর ঢালাওভাবে আর্থিক সাহায্য দেয়ার পিছনে আরও একটা কারণ কাজ করেছে বলে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের ধারণা। সেটা হলো সৌদি ইসলামী র‍্যাডিকেলপন্থী যুবসমাজকে সৌদি আরব থেকে বহু দূরে আফগানিস্তানের মাটিতে ব্যস্ত রাখা, যাতে তারা সৌদি রাজশক্তির জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি না করে। এ জন্যই সৌদি প্রশাসনের একটা মহল এই শ্রেণীর সৌদি যুবকদের তালেবান আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে নানাভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে। আর্থিক সাহায্য হলো সেই কৌশলগুলোরই একটি। কিন্তু আফগানিস্তানে তালেবানদের ক্ষমতায় আরোহণের পর সৌদি আরবে র‍্যাডিকেল ইসলামী শক্তিগুলো নতুন করে উজ্জীবিত হয় এবং আল-সৌদ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিভিন্ন লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে। মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি এমন বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বিদ্রোহের ভাবধারাটা বিশেষভাবে দেখা দেয় সৌদি "আফগানদের" মধ্যে। অর্থাৎ আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সৌদিদের মধ্যে। সৌদি শাসক শ্রেণী আরও লক্ষ্য করে যে, সৌদি আরবে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টিতে বিন লাদেনরেও বিরাট ভূমিকা আছে।

তাই এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রিয়াদ ১৯৯৮ সালের জুনের প্রথমদিকে এক বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়। সৌদি গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান প্রিন্স তুর্কি আল ফয়সাল এবং সৌদি হজ্জ ও ওয়াকফ্ মন্ত্রী মাহমুদ সাকারের নেতৃত্বে গোয়েন্দা ও ধর্মবিষয়ক কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল কান্দাহারে পৌঁছায়। সৌদিরা তালেবানদের সামনে নানা ধরনের টোপ ফেলে। তার মধ্যে

একটি হলো তালেবানরা বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দেবে। বিনিময়ে তারা অঢেল সৌদি সাহায্য ছাড়াও মার্কিন স্বীকৃতি পাবে। লাদেনের ব্যাপারে তালেবানরা কোন প্রস্তাবেই রাজি হয়নি। শেষে দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় যে আরব "আফগানরা" সৌদি আরব বা উপসাগরের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি কোন হুমকির কারণ হবে না। আগে থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে কিছুদিন পরই সৌদি আরবের একটি শীর্ষস্থানীয় পরিবারের দু'জন প্রতিনিধি বিন লাদেনের ঘাঁটিতে গিয়ে তাঁকে বিপুল অঙ্কের অর্থ চাঁদা হিসাবে দিয়ে আসেন। চাঁদাটা এই সমঝোতা হিসাবে দেয়া যে, সৌদি আরবে তিনি কোন তৎপরতা চালাবেন না। শোনা যায় আল-সৌদ রাজপবিরের কিছু কিছু সদস্যের দেয়া অর্থও ছিল এই চাঁদার অংশ। কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই সঙ্কট দেখা দেয়। কাবুলে সৌদি চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স ছিলেন সালমান আল উমারি। তাঁর কার্যালয় ছিল পাকিস্তানে। সেখান থেকে কান্দাহারে গিয়ে তিনি এক সিনিয়র তালেবান নেতার সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসেন।

উমারি দাবি করেন যে, তালেবানদের বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সৌদি আরব বিন লাদেনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তালেবান নেতা তখন জিজ্ঞাসা করেন যে একজন মূসলমানকে একটা অমুসলিম রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাব তিনি একজন মুসলমান হিসাবে কিভাবে দিতে পারলেন? ব্যস, শুরু হলো তীব্র কথাকাটাকাটি। তালেবান নেতা বললেন, "আপনি কি সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত, নাকি যুক্তরাষ্ট্রের? যদি যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে থাকেন তাহলে আমি নিজেকে বিন লাদেনের দূত হিসাবে পরিচয় দিতে সম্মানিত বোধ করব।" তালেবান কর্তৃপক্ষ রিয়াদের নীতির দৃশ্যত আমূল পরিবর্তনের কথা ইসলামাবাদকে জানিয়ে দিল। শঙ্কিত রিয়াদ ইসলামাবাদকে আশ্বস্ত করল যে, সৌদি নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৯৮ সালের জুলাইয়ের শেষ দিকে ইসলামাবাদের মধ্যস্থতায় কান্দাহারে এক বৈঠকে সৌদি আরব ও তালেবানদের মধ্যে এক সুদূরপ্রসারী সমঝোতা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সৌদি গোয়েন্দা সংস্থাপ্রধান প্রিন্স তুর্কি, তালেবান নেতৃবৃন্দ, আইএসআই কর্মকর্তা ও বিন লাদেনের প্রতিনিধিরা।

সমঝোতা হলো এই যে, বিন লাদেন ও তাঁর অনুসারীরা সৌদি আরবে নাশকতা চালানোর কাজে আফগানিস্তানের অবকাঠামো ব্যবহার করবে না। অন্যদিকে সৌদিরাও আর বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দেয়ার কিংবা আমেরিকার হাতে তুলে দেয়ার অথবা জিহাদী শিবির ও স্থাপনা বন্ধ করে দেয়ার দাবি জানাবে না। বৈঠকে প্রিন্স তুর্কি আফগানিস্তান ও পাকিস্তান উভয়কে তেলসহ উদার আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সমঝোতার কিছুদিন পর পাকিস্তান ও তালেবানের জন্য অস্ত্র ক্রয়ের পেমেন্ট বাবদ সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইউক্রেনে পাঠানো হয়। এই অস্ত্র ১৯৯৮ সালের আগস্টের প্রথমদিকে তালেবানদের আক্রমণাভিযান এবং গোটা আফগানিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় দারুণ সহায়ক হয়েছিল। ইতিমধ্যে ৭ আগস্ট নাইরোবি ও দারেস সালামের মার্কিন দূতাবাসে ঘটে গেল বোমা হামলা।

### *আমেরিকার ক্রুজ হামলা*

১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট মার্কিন নৌবাহিনী আফগানিস্তানের খোস্ত এলাকার জিহাদী প্রশিক্ষণ শিবির ও স্থাপনাগুলোর ওপর ৭৫ থেকে ৮০ টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত হানে। নাইরোবি ও দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার জবাবে এই আক্রমণ চালানো হয়। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, ১৩টি ক্ষেপণাস্ত্র মারকায খালিদ বিন ওয়ালিদ নামক এলাকায়, ১০টি

ক্ষেপণাস্ত্র মারকায আমীর মুয়াবিয়া এলাকায় এবং ৫টি ক্ষেপণাস্ত্র জালালুদ্দীন হক্কানীর ঘাঁটিতে আঘাত হানে। অন্য ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আশপাশের গ্রামে গিয়ে পড়ে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বাড়িঘর ধ্বংস হয়েই শুধু নয়, ক্ষেপণাস্ত্রের উড়ন্ত ঠুকরাগুলোর ঘায়েও বিপুলসংখ্যক গ্রামবাসী নিহত হন। আক্রান্ত ঘাঁটিগুলোর মধ্যে আইএসআই নিয়ন্ত্রিত হরকত-উল-আনসারের ঘাঁটিতে প্রায় ১২শ' যোদ্ধা ছিল। যাদের প্রায় সবাই পাকিস্তানী, ভারতীয়, কাশ্মীরী ও আফগান। হক্কানীর ঘাঁটিতে মুজাহিদদের মধ্যে দু'শ' ছিল আফগান এবং বেশকিছু আরব। বিন লাদেনের হিসাবে সবসুদ্ধ নিহত হয় ২৮ জন। তার মধ্যে ১৫ জন আফগান, ৭জন পাকিস্তানী, দু'জন মিসরীয়, তিনজন ইয়েমেনী ও একজন সৌদি। আহতের সংখ্যা ৩৫।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় জিহাদী ঘাঁটিগুলোর দারুণ ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সত্যিই কতটা ক্ষতি হয়েছিল? খোস্ত এলাকার যিনি আদি অকৃত্রিম কমান্ডার সেই জালালুদ্দীন হাক্কানী তো ফুঁ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কথাটা। সোভিয়েত দখলদারির সময় লালফৌজ দু'দফা বড় ধরনের বিমান ও স্থল অভিযান চালিয়ে জাভারার শিবিরগুলো দখলও করতে পারেনি, ধ্বংসও করতে পারেনি। তখন অবিশ্রান্ত বিমান হামলা চলেছিল, গোলাবর্ষণ চলেছিল। ছোট খাটো কিছু ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয়নি হক্কানীর শিবিরগুলোর। পর্বতের গভীরে সুরক্ষিত স্থানগুলোতে নির্মিত ওগুলো। ৬০-৭০ টি মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র সেগুলোর কি করতে পারবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হক্কানী। হক্কানী জানান, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সালমান ফারসী শিবির মোটামুটি অক্ষত ছিল। আল-বদর শিবিরগুলো, যেগুলোর আরেক নাম আবু জান্দাল বা আরব শিবির সেগুলোর নূন্যতম ক্ষতি হয়েছে, আর খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমীর মুয়াবিয়া শিবিরের খানিকটা ক্ষতি হয়েছে। এসব শিবিরের অস্ত্র ও গোলাবারুদের গুদামগুলো ছিল গভীর গিরিগুহায়। সেগুলোর কিছুই হয়নি। সম্পূর্ণ অটুট ছিল। তবে ক্ষতি অবশ্যই হয়েছিল। মুজাহিদ শিবির এলাকায় পাঁচটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল।

মুজাহিদরা ছাড়াও এসব মসজিদে আশপাশের গ্রামবাসীরা এসে নামাজ আদায় করত। শিবির এলাকা ও সংলগ্ন গ্রামের ৪টি মসজিদ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে শহীদ হয়। প্রায় দু'শ' কুরআনের পোড়া পাতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রবল আঘাত হনে। ইসলামী জিহাদীরা এর বদলা নেয়ার নতুন শপথ নেয়। তারা বলতে থাকে যে, মসজিদ শহীদ ও পবিত্র গ্রন্থের অবমাননা করে আমেরিকা নিজের মৃত্যু ডেকে আনছে। তবে মার্কিন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বিন লাদেনকে যতটুকু না আঘাত হেনেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি বিব্রত করেছিল পাকিস্তান সরকারকে। কারণ এ ঘটনার পর প্রকাশ হয়ে পড়ে যে খোস্তের শিবিরগুলোতে পাকিস্তনের আন্তঃসার্ভিস গোয়েন্দা সংস্থার (আইএরআই) বেশ কিছু সদস্য ছিল। এবং তারা কাশ্মীরে গেরিলা যুদ্ধের জন্য হরকত-উল-আনসারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল।

২০ আগস্টের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে তা হলো প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে ১২ আগস্ট জানানো হয় যে, কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার সাথে বিন লাদেনের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ২০ তারিখে এই আঘাত হানার প্রস্তাব দেয়। তারা জানতে পারে যে, ঐ দিন খোস্ত এলাকায় উচ্চপর্যায়ের মুজাহিদ কমান্ডারদের সমাবেশ হওয়ার কথা। উপগ্রহ যোগাযোগ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে বিন লাদেন ও অন্যদের মধ্যকার টেলিফোন সংলাপ মনিটর করে তারা এসব জানতে পারে বলে দাবি করা হয়। অবশ্য ১২ আগস্ট প্রেসিডেন্টের কাছে আক্রমণ পরিকল্পনা পেশ করার সময়

সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উচিত ছিলো গোপন খবরের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা। কারণ ৮ আগস্ট থেকে গোটা আফগানিস্তানের জিহাদী শিবিরগুলোতে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য ও আনাগোনা ঘটতে থাকে। ১৩ আগস্ট এক মার্কিন কর্মকর্তা সিএনএনকে বলেন যে, ৭ আগস্টের বোমা হামলার পর থেকে বিন লাদেনের ঘাঁটির লোকজনকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া হতে থাকে। লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ আরবী দৈনিক আল-হায়াহ পাকিস্তানী নিরাপত্তা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে, বিন লাদেনের কান্দাহার ও জালালাবাদের সদর দফতরে এবং পাহাড়ী প্রদেশ পাকতিয়ার সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলোতে আরব মুজাহিদদের ঘনঘন আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। এমন সম্ভাবনার কথাও বলা হয় যে, খোস্তে এক বড় ধরনের সম্মেলন হতে পারে এবং বিন লাদেন তাতে উপস্থিত থাকতে পারেন। স্বভাবতই আমেকিনরা এমন একটি সুযোগ হারাতে চায়নি।

### *বিন লাদেনের ব্লু প্রিন্ট*

ওসামা বিন লাদেনের জিহাদী নেটওয়ার্ক ধ্বংস এবং তাঁকে হত্যা বা বন্দী করার জন্য আফগানিস্তানে চলছে মার্কিন হামলা। কিন্তু সে অভিযান শেষ পর্যন্ত যদি সফল না হয় তাহলে কি হবে? অনিবার্যভাবে ধরে নেয়া যায় যে, এর ফলে ইসলামী জিহাদীদের পাল্টা আঘাত নেমে আসবে, যার পরিণতিতে লাদেন একজন আঞ্চলিক শক্তির নিয়ন্ত্রায় পরিণত হতে পারেন। সেই মানুষটি তখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার এবং বিশ্বের সিংহভাগ তেল সম্পদ। শোনা যায় লাদেনের আঞ্চলিক আধিপত্যের এটাই হলো নীলনক্সা। লাদেনের নীলনক্সা বাস্তবায়িত হলে বিশ্বে আফিমের বৃহত্তম উৎস আফাগানিস্তানে ইসলামী শাসন চিরস্থায়ী রূপ নেবে। পাকিস্তানের গোঁড়া রক্ষণশীল জেনারেলরা ক্ষমতা দখল করবে এবং সৌদি রাজপরিবারে ভঙ্গন লেগে দেশটি গৃহযুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হবে। পর্যবেক্ষক ও গোয়েন্দা মহলের ধরণা, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য লাদেন ভালমতোই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। যতই হামলা হচ্ছে ততই বিশ্বের দেশে দেশে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এই হামলার বিরুদ্ধে ও লাদেনের পক্ষে সমর্থন বাড়ছে। সৌদি আরবেও জনমত লাদেনের পক্ষে ঝুঁকছে। লাদেন ও তাঁর কর্মকান্ড নিয়ে যথেষ্ঠ গবেষণা করেছেন এমন এক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ টমাস উয়িথিংটনের মতে, আমেরিকা ও ব্রিটেন যতই বিমান হামলা চালাক, বিন লাদেন ঠিকই তার নিজস্ব হিসাব কষে এগিয়ে চলেছেন। তিনি আসলে এই দুটো দেশকে রক্তাক্ত যুদ্ধে টেনে আনতে চান। সেটা সম্ভব হতে পারে যদি দেশ দুটো বিমান আক্রমণ থেকে স্থল আক্রমণের দিকে অগ্রসর হয়। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিরোধ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে লাদেনের। সেই অভিজ্ঞতাকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে লড়াইকে প্রলম্বিত করতে পারবেন বলে তিনি আশা করেন।

আফগানিস্তানে লড়াই যত প্রলম্বিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক দেশগুলোতে বিদ্রোহ ও গণবিক্ষোভ ততই বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সর্বত্রই সরকারবিরোধী শক্তিগুলো উত্তরোত্তর অস্ত্র তুলে নেবে। আর ঠিক এটাই চাইছেন লাদেন। কারণ তা হলেই তার সেই আঞ্চলিক অধিপত্যের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। এদিক দিয়ে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিবেশী পাকিস্তানের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক বলে অনেকে মনে করেন। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিশেষ করে পেশোয়ারে প্রচ- ভিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। জিহাদপন্থী শক্তিগুলো সেই বিক্ষোভকে তীব্রতম অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইবে এমনই আশা করা যেতে পারে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে গোঁড়া রক্ষণশীল অংশের মধ্যে জেনারেল মোশাররফের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এরা মোশাররফের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দেখা

দেবে। ক'দিন আগে সেনাবাহিনীর দু'জন জেনারেলকে বরখাস্ত করার ঘটনা তারই আলামত। মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ যদি পাকিস্তানকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয় তাহলে তার সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর জিহাদ সমর্থক অংশটির অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বসা বিচিত্র কিছু নয়। আর এই অংশটি ক্ষমতায় আসতে পারলে তো লাদেনের জন্য পোয়াবারো। পাকিস্তান তখন হবে তাঁর দ্বিতীয় আবাসভূমি। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে লাদেনের সমর্থক কম নেই। সন্দেহ নেই তারা দীর্ঘদিন ধরে লাদেনকে অস্ত্র ও গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে এসেছে। পাকিস্তানের প্রতি বিন লাদেনের দৃষ্টি পড়ার একটা কারণ হতে পারে এর পারমাণবিক অস্ত্র। বিভিন্ন সময় সাক্ষাতকারে লাদেন এই পরমাণু অস্ত্রের কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানে তালেবানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে লাদেন অন্তত ৩০টি পারমাণবিক বোমার অধিকারী হতে পারবেন, যার প্রতিটির বিধ্বংসী ক্ষমতা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বেমার প্রায় আড়াই গুণ বেশি। ব্যাপারটা তাঁর জন্য কম প্রলুব্ধকর নয়। ইরান আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার বিরোধিতা করলেও দেশটি বিন লাদেনের আঞ্চলিক অধিপত্যের নীলনক্সার অন্তর্ভূক্ত নয়। তার একটা মূল কারণ দেশটি শিয়া মুসলিমপ্রধান, যারা ঐতিহ্যগতভাবে সুন্নী পশতুদের বিরোধী। আর তালেবান সরকারে এই সুন্নী পশতুদেরই একাধিপত্য। তবে সাবেক আফগান যুদ্ধবাজ গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার তেহরানের র‍্যাডিকেল বিরুদ্ধবাদীদের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি লাদেনের জন্য সমর্থন গড়ে তুলতে পারেন। তাহলে সে ক্ষেত্রে বিদ্রোহের আগুন দক্ষিণ ওমান উপসাগরের দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সৌদি রাজবংশ হবে এর পরবর্তী টার্গেট। সৌদি সরকার লাদেনবিরোধী মার্কিন হামলা সমর্থন করলেও সৌদি জনগোষ্ঠির মধ্যে লাদেনের সমর্থক কম নেই। কারণ তাদের মতে অন্যরা যা করতে পারে না লাদেন তা করতে সক্ষম। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তাদের মধ্যে লাদেনের ইমেজ আরও বেড়ে গেছে। সৌদি আরবেও জিহাদপন্থী গ্রুপের অস্তিত্ব আছে এবং তারা সে দেশে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের ওপর হামলার পরিকল্পনা করছে বলে শোনা যাচ্ছে। যদি সত্যি তা করতে পারে তাহলে এ জাতীয় হামলার প্রতি ওলামা সম্প্রদায়ের প্রচন্ড সমর্থন থাকবে। কারণ তাদের মতে, একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন অমুসলমানের পক্ষ নেয়া ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। সৌদি আরবে বিন লাদেনের সমর্থক ১০ হাজার সাবেক মুজাহিদ রয়েছে, যারা আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। তবে ক্ষমতা দখলের মতো শক্তি তাদের নেই। লাদেনের জন্য এদের চেয়েও বেশি সহায়ক হবে সৌদি রাজপরিবারের ক্ষমতাদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব রাজপরিবারের শত শত শাহজাদাকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করেছে। কোন কোন উপদল লাদেনকে রীতিমতো সমর্থন করে। তাঁকে গোপনে নিয়মিত অর্থ সাহায্য দেয় বলে জানা গেছে।

লাদেন এক সময় আমেকিান লবির লোক ছিলেন। মার্কিন গোয়েন্দাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সুদূর আফগানিস্তানে গিয়ে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধ সংঘটনে অংশ নিয়েছিলেন। সেই লাদেন আমেরিকার ওপর বিগড়ে যান উপসাগর যুদ্ধের সময় সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্য মোতায়নকে কেন্দ্র করে। ইসলামের পবিত্র ভূমিতে বিধর্মী সৈন্য উপস্থিতির মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে তাঁর মার্কিনবিরোধিতার প্রতি সৌদি রাজপরিবারের একাংশ, উলামা সম্প্রদায়ের বড় অংশ ও সাধারণ জনগণের ব্যাপক সমর্থন আছে। লাদেন যদি মার্কিন হামলার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে আফগান যুদ্ধকে প্রলম্বিত করাতে পারেন তাহেল ভবিষ্যতে সৌদি শাসকশ্রেণীর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ আছে। সেক্ষেত্রে লাদেন অনুগতরা সৌদি সমাজের বিভিন্ন অংশের অসন্তোষকে পুঁজি করে সে দেশে বিদ্রোহ বা গণঅভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে সৌদি রাজতন্ত্রকে উৎখাত করলে তো আর কথাই নেই। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে লাদেনের মিত্রদের। আর

সম্ভবত সেই সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখেই যুক্তরাষ্ট্র সৌদি তেলক্ষেত্রগুলো নিরাপদ রাখার চেষ্টায় সে দেশে মোতায়েন মার্কিন সৈন্যসংখ্যা ২০ হাজারে বাড়িয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। বিন লাদেনের অনুগত সৈন্যের সংখ্যা কত সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে আফগানিস্তানে অবস্থানরত ১৩ টি আরব দেশের যোদ্ধা তার বাহিনীতে আছে। এছাড়া তাঁর আল কায়দা নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে বিশ্বের দেশে দেশে। এরা তাঁর ইসলামী বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ওয়াদাবদ্ধ। ওটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস একদা মুগ্ধতার সঙ্গে পাঠ করেছেন লাদেন। হয়তো সেই সাম্রাজ্যই নতুন আঙ্গিকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেন তিনি।

বইটিতে যেভাবে আছে আমি সেভাবেই প্রকাশ করেছি। কোন প্রকার কাটছাট করা হয় নি।সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী-